শান্টুর টিম

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

শান্টুর কোনও টিম নেই। থাকার মধ্যে আছে একটা সবুজ সাইকেল আর গাবদু নামে একটা কুকুর। পাড়ার স্বর্ণাভদের 'ইয়ং মাস্টার্স' ক্লাবের ফুটবল টিম আছে। মিতালিদির নাটকের টিম আছে। স্কুলে ওদের ক্লাস সেভেনের ফুটবল টিম আছে। কিন্তু কোনওখানেই শান্টুর জায়গা হয় না। আসলে কেউ শান্টুকে নিতে চায় না। জায়গাই দিতে চায় না টিমে।

Scanned with CamScanner

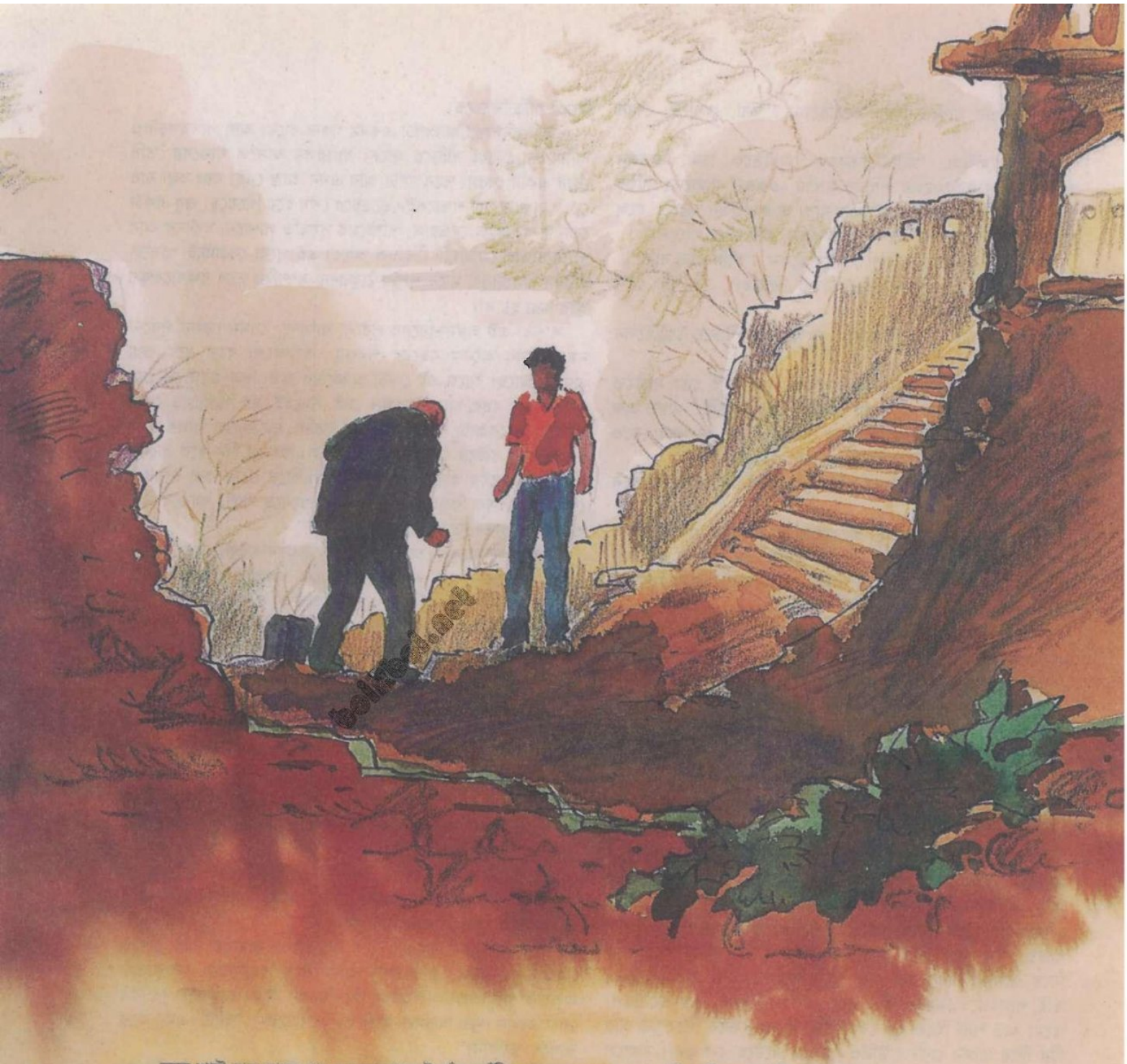

তবে শান্টু হাল ছাড়ে না। সব জায়গাতেই গুঁতোগুঁতি করে ঢুকতে চায়। কিন্তু সকলেই বলে, "যা না, নিজের টিম তৈরি কর গিয়ে।"

একা-একা কী টিম তৈরি করবে শান্টু? লুডোর না কিতকিতের? কিন্তু লোকে বোঝে না।

এই যেমন আজই তো ক্লাস সেভেন থেকে কুইজের টিম তৈরি হল। লখনসায়রের যত স্কুল আছে, সেগুলোর মধ্যে একটা কুইজ কনটেস্ট হবে। ফাইভ থেকে সেভেন একটা গ্রুপ, আর এইট থেকে টেন আর-একটা গ্রুপ তৈরি হবে।

অ্যাসেমব্লি হলে সকলের সামনে যখন এক-এক করে নাম ডাকা হচ্ছিল, শান্টুর আশা ছিল, হয়তো ওর নামও ডাকা হবে। কিন্তু শেষ নামটা ডাকা হল তমোনাশ রায়ের, মানে ওর বেস্ট ফ্রেন্ড তমোর। মাথায় একেবারে আগুন জ্বলে গিয়েছিল শান্টুর। হতে পারে তমো ক্লাস সেভেনের ফার্স্ট বয়, তা বলে শান্টুকে এভাবে ওভারলুক করবে সকলে? তমো ওর বন্ধু না? এক বন্ধুকে রেখে আর-এক বন্ধুকে নেওয়া? হেডস্যার যে বন্ধুবিচ্ছেদের চক্রান্ত করছেন!

শান্টু আর নিজেকে আটকাতে পারেনি। "স্যার," বলে হাত তুলেছিল। শান্টুর কাজকর্ম স্কুলের সকলে জানে। তাই স্যার আশঙ্কিত হয়ে তাকিয়েছিলেন, "কী হয়েছে?"

"স্যার, আমি টিমে নেই?" শান্টু গম্ভীর গলায় জানতে চেয়েছিল।

"তুই? না, নেই। থাকলে তো নাম বলাই হত।"

"কেন স্যার? আমি নেই কেন?"

"মানে?" স্যার চোখ পাকিয়েছিলেন, "তুই আমাকে প্রশ্ন করছিস? তোর সাহস তো খুব বেশি! আর এমনিতে পড়াশোনায় তো অষ্টরম্ভা। সেখানে তুই কুইজে যাবি? মজা নাকি?"

শান্টু বুক চিতিয়ে বলেছিল, "অষ্টরম্ভা মানে? আমি সব জানি।"

"সব জানিস? আচ্ছা বল তো, ভারতের কোথায়-কোথায় তেল পাওয়া যায়? ক্লাস সেভেনে তো পড়িস! এটা বল দেখি।"

"এ তো সোজা! মুদির দোকানে, রেশনের দোকানে আর পেট্রোল পাম্পে।" শান্টু অনায়াসে উত্তর দিয়েছিল।

"বদমাশ কোথাকার!" সংস্কৃতস্যার পাশ থেকে লাফিয়ে উঠেছিলেন প্রায়, "মুদির দোকান! পেট্রোল পাম্প! যত্তসব হাবিজাবি কথা! আচ্ছা এটা বল, 'তমস মা জ্যোতির্গময়'-এর মানে কী?"

শান্টু ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে বলেছিল, "তুমি শোও মা, আমি জ্যোতির কাছে যাচ্ছি।"

Scanned with CamScanner

সংস্কৃতস্যার ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলেন, "অ্যাঁ, জ্যোতি! কোন জ্যোতি?"

শান্টু বলেছিল, "আমি তিনজন জ্যোতিকে চিনি। একজন মল্লিকবাজারে সাইকেলের পাংচার সারায়, একজন আমাদের বাড়ির পিছনের মাঠ থেকে ঘাস কেটে নিয়ে যায়। আর-একজন 'মহেন্দ্র' হলে টিকিট ব্ল্যাক করে। এখন আপনি ঠিক করুন, কার কাছে যাবেন।"

"আমি?" সংস্কৃতস্যার ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, "আমি কেন যাব?"

"তা আমি কী জানি?" শান্টু উত্তর দিয়েছিল, "আপনি কেন যাবেন, আপনি জানেন।"

"আমি বলেছি যে আমি যাব?" সংস্কৃতস্যার খিঁচিয়ে উঠেছিলেন এবার।

"বাঃ!" শান্টু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, "আপনিই তো সংস্কৃতে বললেন, 'তুমি শোও মা, আমি জ্যোতির কাছে যাচ্ছি।' এখন এক অ্যাসেম্বলি ছেলের সামনে অস্বীকার করছেন? তা, আপনার যেতে ইচ্ছে করছে না, আপনি যাবেন না। আমায় বকছেন কেন?"

এর পর সংস্কৃতস্যার নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছিলেন শুধু।

তখন অবস্থা সামলাতে ইংরেজিস্যার ময়দানে নেমেছিলেন। শান্টুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা সায়ন্ত, সে তো না হয় হল। এবার বল দেখি, 'আই কিল্‌ড এ পারসন' এই সেনটেন্সটাকে ফিউচার টেন্‌স-এ বদলে দিলে কী হবে?"

শান্টু হেসে বলেছিল, "স্যার, আমি কি বাচ্চা ছেলে, যে এটা জানব না? সেনটেন্সটা হবে, 'ইউ উইল গো টু জেল'।"

হেডস্যার আর নিতে পারেননি। প্রায় দৌড়ে এসে শান্টুর কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে অ্যাসেম্বলির লাইন থেকে বের করে দিয়ে বলেছিলেন, "এই স্কুলে থাকতে আর কোনওদিন যদি কুইজে নাম দেব বলেছিস, তা হলে তোরই একদিন কী আমারই একদিন!"

এভাবে স্যার সকলের সামনে কান ধরবেন, এটা শান্টু মেনে নিতে পারেনি। তাই তখন থেকে মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। প্রতিদিনের মতো আজ আর তাই তমোর সঙ্গে না ফিরে নিজের সবুজ সাইকেলটা নিয়ে একা-একাই বাড়ি ফিরেছে। তবে আসার পথে পাথরগড় হয়ে এসেছে একবার। আসলে এই পাথরগড়ে দিনে একবার না এলে শান্টুর মনে হয় দিনটা অসম্পূর্ণ। কারণ, এখানে থাকে গাবদু। গাবদু একটা মিক্সড ব্রিডের কুকুর। গঙ্গার ধারে কে বা কারা ওকে বছরখানেক আগে বস্তায় বেঁধে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। শান্টু ওটাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মা এমন বকুনি দিলেন যে, রাখতেই পারেনি। তাই পাথরগড়ে নিয়ে একটা ঢাকা জায়গায় রেখে দিয়ে এসেছিল। তমো আর শান্টু মিলে ওর দেখাশোনা করে। দু'জনে পিচবোর্ড আর টিন দিয়ে একটা ছোট ছাউনিও বানিয়ে দিয়েছে ওর জন্য। সকালে স্কুল যাওয়ার পথে আর বিকেলে ফেরার পথে শান্টু ভাল পরিমাণে খাবার রেখে যায় গাবদুর থালায়। মাকে লুকিয়ে, রান্নার মিনুদির থেকে ভিখিরিকে দেবে বলে খাবারটা ম্যানেজ করে ও। আজও সেই খাবার দিয়েই বাড়ি ফিরেছে।

এই লখনসায়র জায়গাটা একদম গঙ্গার ধারে। আর পাথরগড়টাও নদীর পার ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে। পাথরগড় আসলে পাথরের তৈরি ছোট্ট একটা কেল্লা। তবে সেটা আর এখন আস্ত নেই। বরং বলা যায় যে, তার প্রায় ষাট শতাংশই ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা তোরণ, কয়েকটা দেওয়াল, পশ্চিমের সূর্যঘড়ি লাগানো ঘণ্টাঘর আর দু'টো চাতাল মোটামুটি ঠিকঠাক আছে। এই পুরো কেল্লাটাই আসলে হরিধন রায়চৌধুরী মানে শান্টুর ঠাকুরদার সম্পত্তি। তবে রক্ষণাবেক্ষণ আর করা হয় না।

শান্টুরা এই লখনসায়রের পুরনো বাসিন্দা। যেমন-তেমন পুরনো নয়। অনেক-অনেক বছরের পুরনো। কয়েকশো বছর ধরে ওরা এখানে আছে। আগে এই গোটা অঞ্চলটার রাজা ছিল ওরা। সে প্রায় আট-ন'শো বছর আগের কথা। সেই সময়েই এই পাথরগড় তৈরি করে ওরা। কেল্লাটা কালো পাথরের তৈরি। এই কালো পাথর নাকি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল। অনেক দিন ধরে অনেক খরচ করে সূর্যের আহ্নিক গতির সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছিল কেল্লাটা। এ সব কিছুই ঠাকুরদার মুখে শুনেছে শান্টু। আর বাকিটা শুনেছে ডাকাতদাদুর কাছ থেকে।

ডাকাতদাদু মানে সাত্যকি গুহ। তিনি ঠাকুরদার বন্ধু। বেশ কিছুদিন ওদের বাড়িতে থেকে ডাকাতদাদু পুরনো বাংলার রাজাদের নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। মানুষটা রোগাপাতলা হলেও গলার জোর ছিল ভীষণ। বাড়িতে হাসিঠাট্টা, হইহল্লা করে ভরিয়ে রাখতেন একদম। ঠাকুরদা বলতেন, "সাত্যকি, এমন চিৎকার চেঁচামেচি করিস যে, মনে হয় ডাকাত পড়েছে বাড়িতে!"

"ডাকাতই তো। আমি তো চিরকালীন ডাকাত। না হলে ওরা সকলে আমায় এমনি-এমনি 'ডাকাতদাদু' বলে? তবে হরিধন, তোদের এখানে যা আছে না, তাতে বাড়িতে সত্যিকারের ডাকাত পড়ল বলে!"

"মানে?" ঠাকুরদা বুঝতে পারেননি।

ডাকাতদাদু বলেছিলেন, "হরিধন, তোর ছোটকাকা দুর্লভকান্তির একটা ছোট্ট লেখা পেয়েছি। তাতে... না থাক, এর বেশি আর বলব না এখন। সব সময় হলে জানবি।"

এর পর ডাকাতদাদু হঠাৎই একদিন চলে গিয়েছিলেন বাড়ি ছেড়ে। শুধু যাওয়ার আগে বলেছিলেন, "হরি, আমি আবার আসব। তবে অনেক ভাল খবর নিয়ে আসব। বুঝলি?"

কিন্তু বোঝেননি ঠাকুরদা। বাবা, মা, কাকা, মামাতো দাদা, কেউই বোঝেননি। কারণ, ডাকাতদাদু আর ফিরে আসেননি। কলকাতায় যাওয়ার পর আচমকাই মারা গিয়েছিলেন উনি। ঠাকুরদা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন বন্ধুর আচমকা মৃত্যুতে। বলেছিলেন, "ব্যাটা, এমন করে ভাগবে, ভাবিনি।"

বাড়িতে ফিরে সাইকেলটা রেখে নিজের ঘরে গেল শান্টু। পিঠের ব্যাগটা বিছানায় ছুড়ে দিয়ে জামা খুলতে যাবে, এমন সময় দরজার কাছ থেকে খুকখুক করে কাশি প্লাস হাসির আওয়াজ এল। এই রে

সোনাদা!

শান্টুর এই মামাতো দাদাটি এখানে থেকে পড়াশোনা করে। সে কাছেই একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। এই বাড়িতে থাকলে যাতায়াতে সুবিধে হবে বলে এখানে থাকে। বাবাই বলেছেন থাকতে।

সোনাদা বলল, "কী রে শান্টু? এবার যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্‌স হয়ে যাবি!"

"মানে?" শান্টু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল।

"মানে বুঝছিস না? শান্টু থেকে শান্টিং হবে। স্কুলে কী করেছিস? হেডস্যার ফোন করেছিলেন যে!"

শান্টু মুখ বিকৃত করল। নামী বাড়ির ছেলে হলে এই এক প্রবলেম। পান থেকে চুন খসলেই রিপোর্ট হয়ে যায় বাড়িতে। আসলে হবে না কেন? দাদু যে ওদের স্কুলেরই প্রেসিডেন্ট!

শান্টু ব্যাজার মুখে বলল, "তো আমি কী করব?"

"তুই?" সোনাদার দশ টাকার মতো হাসিটা হাজার টাকার নোট হয়ে গেল, " 'তুমি শোও মা, আমি জ্যোতির কাছে যাচ্ছি' ! যা না, পিসেমশাই তোর জ্যোতি কেমন নেভান দ্যাখ।"

"অ্যাঁ, বাবা বাড়িতে ফিরেছেন?" শান্টু ভয় পেল। বাবা মারেন না কখনও, কিন্তু এমন করে তাকান যে, শান্টুর শরীরের সব কল-কব্‌জা কেমন যেন ঢিলে হয়ে যায়। আর হেডস্যার যেদিন ফোন করলেন, বাবা সেদিনই তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন!

সোনাদা শান্টুর মেজাজ আরও গরম করে দিয়ে বলল, "হেডস্যার সব বলেছেন। তুই নাকি কুইজ টিমে নেই বলে এসব করেছিস? সত্যিই তুই অপদার্থ। কুইজ টিমেও তুই নেই? তোর কপালে কোনওদিন কোনও টিম জুটবে না, বুঝেছিস?"

॥ ২ ॥

ছেলেটার পরনে জিনস আর টি-শার্ট। পায়ে সবুজ রঙের দামি স্নিকার। পাতলা ফরসা চেহারা। হিন্দি ছবির হিরোর মতো দেখতে। বয়স বড় জোর সাতাশ-আটাশ হবে। আর সঙ্গের মোটা লোকটার বয়স প্রায় চল্লিশ। পরনে সাফারি সুট। গলায় একটা মোটা দড়ির মতো সোনার চেন। ছেলেটা যেমন চনমনে, সঙ্গের লোকটা ততটাই গম্ভীর। যেন রামগরুড়ের অরিজিনাল ছানা।

লখনসায়র মডেল হাই স্কুলের বিশাল বড় মাঠে গেস্ট হাউসটা এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকটা অভিমানী ছেলের মতো! চারদিকে ঘন দেবদারু গাছ ঘিরে রেখেছে গেস্ট হাউসটাকে। তারই ছায়ায় গেস্ট হাউসটা আরও নির্জন মনে হচ্ছে।

ছেলেটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, দূরের মাঠে ছেলেরা খেলছে। স্কুলে টিফিন আওয়ার্স এখন, তাই মাঠটায় ছেলেদের ভিড়।

লখনসায়র জায়গাটাকে এসেই ভাল লেগে গিয়েছে ছেলেটার। চারদিকে বড়-বড় ফাঁকা মাঠ। একতলা, দোতলা সব বাগানঘেরা বাড়ি। চওড়া রাস্তা। পাশে গঙ্গা আর পুরনো একটা কেল্লা। এসব নিয়ে যেন সিনারির মতো সাজানো একটা পুঁচকে শহর।

"এখন এলেন?"

পাশ থেকে আসা প্রশ্নে ছেলেটি তাকাল, "আমায় বলছেন?" সে দেখল, বয়স্ক একজন গোলগাল চেহারার লোক পাজামা-পাঞ্জাবি পরে চেয়ারে বসে আম খাচ্ছেন।

"হ্যাঁ," লোকটি হাসলেন, "আপনাকেই বলছি। কোন ট্রেনে এলেন? দুপুরে তো কোনও ট্রেন নেই?"

ছেলেটি হাসল, "সকালের ট্রেনে এসেছি। কিন্তু সেটা লেট ছিল।"

"তা এখানে কেন এসেছেন?" লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, "মানে, ঘুরতে তো আসেননি, না?"

ছেলেটি বলল, "না, ঠিক বলেছেন। ঘুরতে আসিনি। আমি মেন্‌লি টুরিজ্‌মের জন্য এসেছি।"

"টুরিজ্‌ম?" লোকটি আম খাওয়া থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "আরে সরি, আমার পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি। আমার নাম অয়নাঙ্ক রায়। গঙ্গার ধারের যে ইটভাঁটা আছে, সেখানে কাজের জন্য এসেছি। তা টুরিজ্‌ম না কী যেন বলছিলেন?"

ছেলেটি হাসল, "হ্যাঁ। আমার নাম শ্রবণ মুখোপাধ্যায়। এখানে এসেছি রিসর্টের জন্য।"

"রিসর্ট?" অয়নাঙ্ক অবাক হলেন।

"হ্যাঁ, গঙ্গার ধারে যে পাথরের কেল্লাটা আছে, সেটা আমাদের কোম্পানি কিনে নিয়ে রিসর্ট বানাতে চায়।"

"ও!" অয়নাঙ্ক হাসলেন, "আমার কার্ড রাখুন। আমরা মাল্টিপ্‌ল অ্যাপ্লায়েন্স সাপ্লায়ার। রিসর্ট-টিসর্ট বানালে তো শুনেছি মেলা জিনিসের দরকার হয়। আমাদের তখন একটু দয়া করবেন, কেমন?"

শ্রবণ কার্ডটা নিয়ে হাসল, "কিন্তু আমি যে কার্ড দিতে পারব না। নতুন জয়েন করেছি তো, তাই কার্ড হয়নি এখনও। দেখুন না, অফিসের একজনের সঙ্গে সোজা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

অয়নাঙ্ক হেসে উঠে পড়লেন, "ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি একাকিত্ব উপভোগ করুন। আর আপনার মাথা খাব না। বরং আমি আসি এখন।"

গেস্ট হাউসের বারান্দা থেকে ঘরে এল শ্রবণ। গরমটা বেশ বেশিই পড়েছে।

"পুনিত, তুমি স্নান করে একটু শুয়ে নাও। বিকেলে বেরোতে হবে।" শ্রবণ ঘরে ঢুকে বিছানায় রাখা ল্যাপটপটা অন করে বলল।

পুনিত বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছিল। সে বলল, "কার সঙ্গে কথা বলছিলে তুমি?"

"ও একজন এমনি লোক। নাথিং সিরিয়াস।"

পুনিত ওর গলার মোটা সোনার চেনটা ঠিক করে নিয়ে বলল, "আঃ, সকলের সঙ্গে কথা বলার কি খুব দরকার আছে? কাজটা যদি...!"

"শাট আপ।" শ্রবণ কড়া চোখে তাকাল পুনিতের দিকে, "বেশি স্টিফ হয়ে গেলেই লোকে সন্দেহ করবে। আমায় কাজ শিখিয়ো না। যখন তোমার টার্ন আসবে, তখন জাস্ট তোমার কাজটা করবে। কথাবার্তা যা বলার, তা আমিই বলব। বুঝেছ? তুমি স্নানে যাও।"

শ্রবণের বয়স কম হলেও পুনিত সমঝে চলে শ্রবণকে। পুনিত জানে, ছেলেটার মাথাটা খুব পরিষ্কার।

পুনিত বাথরুমে ঢোকামাত্র ই-মেল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করল শ্রবণ। একটা জরুরি মেল আসার কথা আছে।

শ্রবণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। মেলটা এসে গিয়েছে। মেল-এর উপর ক্লিক করে শ্রবণ চিঠিটা খুলে ফেলল। ইস্তানবুল থেকে এক কিউরিয়ো এজেন্টের চিঠি এসেছে। সে লিখেছে, 'কাজ কত দূর এগোল? আমি অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়েছি। পার্টি চাপ দিচ্ছে। ডু ইট ফাস্ট।'

শ্রবণ রিপ্লাই বাটনে ক্লিক করে জবাব লিখল, 'আর বড় জোর সাতদিন। তারপর দেখা হচ্ছে।'

সাতদিন! আর বড় জোর সাতদিন সময় পাবে ও। তার মধ্যে ওকে খুঁজে নিয়ে যেতে হবে মহামূল্যবান জিনিসটা। এতদিন ধরে চোরাগোপ্তাভাবে জানা কিংবদন্তিটা যদি সত্যি হয়, তা হলে লক্ষ-লক্ষ ডলার এবার স্বপ্ন থেকে বাস্তব হয়ে উঠবে।

ল্যাপটপটা বন্ধ করে শ্রবণ সুটকেস খুলে ভিতরের খাপ থেকে লাল রঙের ছোট্ট একটা খাম বের করল। তারপর খামটা খুলে বের করে আনল একটা হলদেটে পৃষ্ঠা। বহুদিন আগেকার এই পৃষ্ঠার হাতে লেখা কালি প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। তবু পড়া যায় স্পষ্ট।

লেখাটা পড়ে শ্রবণ হাসল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের লেখা। সত্যি! পুরনো জিনিসও যে কত কাজে লাগে। অবশ্য এর জন্য স্যারকে ধন্যবাদ। স্যার এটা খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই তো ও এটা পেয়েছিল। তবে স্যারকে সরাতে হয়েছিল। 'সরি স্যার।' শ্রবণ মনে-মনে বলল। যেন দেখতে পেল, মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে স্যারের অবিশ্বাসভরা দু'টো চোখ। স্যার বুঝতে পারেননি, শ্রবণ এমন করবে। কিন্তু টাকার জন্য জীবনে অমন অনেক কিছুই করতে হয়। 'স্যার, স্যার' বলে তো অনেক অনুনয়ও করছিল শ্রবণ। বলেছিল, 'একবার এই সঙ্কেতের

Scanned with CamScanner

মানেটা বলে দিন, স্যার! একটু হেল্প করুন! আমরা দু'জনেই লাভবান হব। আমার টাকার খুব দরকার, স্যার। আপনি একটু বুঝুন ব্যাপারটা। প্লিজ, আমায় সাহায্য করুন।'

কিন্তু সাত্যকি গুহ বুঝলেনই না। অবুঝ মানুষদের তো না বোঝার দাম দিতেই হয়!

॥ ৩ ॥

তমো বলল, "তুই এমনটা না করলেও কিন্তু পারতিস শান্টু! কী দরকার ছিল ওই দ্বৈপায়নের সঙ্গে ঝামেলা করার? একেই তো অমন লম্বা-চওড়া চেহারা, তার উপর হেডস্যারের রিলেটিভ। ফালতু ঝামেলা করলি তো।"

"হেডস্যারের রিলেটিভ তো কী হয়েছে? আমার ঠাকুরদাও তো স্কুলের প্রেসিডেন্ট, তার বেলায় আমি কি সেই রিলেটিভিটি দেখিয়ে বেড়াই?"

"রিলেটিভিটি মানে?" তমো থমকে দাঁড়াল, "কী যা তা ইংরেজি বলছিস? আইনস্টাইন যে ভিরমি খাবেন!"

"ভাগ, বেশি জ্ঞান দিবি না। জানি, তুই ফার্স্ট হোস, তার মানে কি এই যে, সব সময় অমন পণ্ডিতি দেখাতে হবে?" শান্টু তেরিয়াভাবে বলল।

তমো ঠান্ডা মাথার ছেলে। সহজে রাগ করে না। এখনও করল না। বরং বলল, "শোন শান্টু, তোর এই হুটহাট করে উলটোপালটা কাজকর্ম করা, যা খুশি তাই বলার প্রবণতাটাই তোকে ঝামেলায় ফেলে। আচ্ছা, আজ প্রায় প্রত্যেকটা ক্লাসে ভুলভাল করেছিস কেন তুই? এমন উলটোপালটা উত্তর দিলে স্যারেরা তো রাগ করবেনই।"

শান্টু মাথা নিচু করল। আসলে সকালে স্কুলে ঢুকেই দ্বৈপায়নের সঙ্গে জল খাওয়া নিয়ে ঝামেলা হয়ে গিয়েছে। তাই গোটা দিনটাতেই ওর মেজাজটা খাট্টা হয়ে ছিল।

দ্বৈপায়ন ওদের ঠান্ডা জলের কলটায় কিছুতেই জল খেতে দিচ্ছিল না শান্টুকে। শান্টু দু'-তিনবার বললেও শোনেনি। তাই শান্টু আর অনুরোধের রাস্তায় না গিয়ে আচমকা দ্বৈপায়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর ধস্তাধস্তি করে দ্বৈপায়নের জামার পকেট ছিঁড়ে দিয়েছিল। এতক্ষণ শান্টুকে পালটা মার দিলেও দ্বৈপায়ন হঠাৎ কাঁচুমাচু মুখ করে বলেছিল, 'আমার জামাটা ছিঁড়ে দিলি? জল খেতে দিলি না! তার উপর আমায় মারলিও? কেন এমন করছিস তুই?'

কী বলছে দ্বৈপায়ন? খুব অবাক হয়েছিল শান্টু। এ তো ডাহা মিথ্যে কথা! ও বলেছিল, 'কী বলছিস তুই? আমি...!'

ওকে কথা শেষ না করতে দিয়ে দ্বৈপায়ন ওর কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'স্যার, দেখুন স্যার, ও আমায় কী করল?'

'স্যার?' ঘাবড়ে গিয়ে পিছনে তাকিয়েছিল শান্টু। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল। হেডস্যার দাঁড়িয়েছিলেন যে!

হেডস্যার সজোরে শান্টুর কান ধরে মিউজিক সিস্টেমের ভলিউম বাড়ানোর মতো করে ঘুরিয়ে বলেছিলেন, 'আবার তুই শয়তানি করছিস? একদম মারামারি শুরু করেছিস? এত সাহস তোর?'

'স্যার, আমি কিচ্ছু করিনি। এই দ্বৈপায়নটাই...।'

স্যার কিচ্ছু শোনেননি। এই কানটা ধরেই হিড়হিড় করে টানতে-টানতে টিচার্স রুমের সামনে নিয়ে গিয়ে শান্টুকে বলেছিলেন, 'আমি নিজে দেখেছি তুই দ্বৈপায়নের জামার পকেট ছিঁড়েছিস। আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে? সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? দাঁড়া, এখানে কান ধরে দু'টো পিরিয়ড দাঁড়িয়ে থাকবি। বুঝেছিস? একদম নড়বি না, শয়তান ছেলে!'

দ্বৈপায়ন রিলেটিভ বলে হেডস্যার এমন পারশিয়ালিটি করবেন, ও ভাবতেই পারেনি। কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় শান্টু তাই ঠিক করেছিল যে, থার্ড পিরিয়ডে হেডস্যারের জিওগ্রাফি ক্লাসে ও স্যারের ক্লাস নেবে অর্থাৎ মজা দেখিয়ে ছাড়বে!

হেডস্যার 'আমাদের পৃথিবী' কথাটা বোর্ডে লিখে ক্লাস শুরু করেছিলেন। তারপর এটা-সেটা বলতে-বলতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোরা জানিস 'সেন্টার অফ Gravity' কী? বল দেখি, সেটা কী জিনিস?'

তমো হাত তুলতে গিয়েছিল। কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে তমোর হাত চেপে ধরে ডান হাত তুলে লাফিয়ে উঠেছিল শান্টু, 'আমি স্যার, আমি। আমি জানি।'

'তুই বলবি?' হেডস্যার ভুরু কুঁচকে ছিলেন, 'ঠিক আছে, বল।'

শান্টু গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'V।'

'মানে?' হেডস্যার এমন করে তাকিয়েছিলেন, যেন অন্ধকারে পকেট থেকে পাঁচশো টাকার চারটে নোট পড়ে গিয়েছে।

'Gravity তে সাতটা অক্ষর। সেন্টার-এ কোনটা আছে? V অক্ষরটা। সিম্পল। এটা তো খুব সোজা!' শান্টু হেসেছিল খুব।

স্যার দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিলেন, 'মজা হচ্ছে? আমার সঙ্গে মজা হচ্ছে? শাস্তির পরও শিক্ষা হয়নি তোর? আরও দু'টো পিরিয়ড দাঁড়াবি?'

তমো ফিসফিস করে বলেছিল, 'চুপ করে বোস শান্টু। স্যার কিন্তু খুব রেগে যাচ্ছেন। মজা করিস না একদম।'

শান্টু তখনকার মতো চুপ করে বসলেও পিরিয়ডের শেষের দিকে আবার মুখ খুলেছিল।

হেডস্যার ছবি এঁকে চাঁদ আর সূর্যের কতটা গুরুত্ব, এসব ডিটেলে বুঝিয়ে ক্লাসের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এবার বলো তো কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীর পক্ষে, সূর্য না চাঁদ?'

কেউ হাত তোলার আগেই স্প্রিং-এর পুতুলের মতো টুং করে দাঁড়িয়ে উঠেছিল শান্টু। স্যারের কোনও কথার অপেক্ষা না করেই বলেছিল, 'এ তো খুবই সোজা স্যার। ভীষণ সোজা।'

হেডস্যার নিজে থেকেই যেন বলে ফেলেছিলেন, 'আবার তুই? আর ভীষণ সোজা? কতখানি সোজা শুনি?'

শান্টু গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'সকালে তো আলো থাকেই, তখন আর সূর্যের কী দরকার? রাতে যখন আলো থাকে না, তখন চাঁদ উঠে আলো দেয়। তা হলে কোনটা দরকারি হল? হ্যাঁ ঠিক, চাঁদই অনেক বেশি দরকারি। তবে আর-একটা কারণেও চাঁদের দরকার আছে। মান্না দে না হলে কষ্ট পেতেন।'

'কে?' হেডস্যার বুঝতে পারেননি শান্টুর কথা।

'মান্না দে স্যার, মান্না দে। ওই যে খুব ভাল গান করেন। গোঁফ আছে।'

'মান্না দে? চাঁদ?' হেডস্যারের মুখে কথা সরছিল না।

'ওই যে স্যার উনি গেয়েছেন না, 'চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি', ভাবুন তো, চাঁদ না থাকলে উনি চাঁদ দেখতে গিয়ে কীভাবে অন্য একজনকে দেখে অমন খুশি হয়ে এমন একখানা গান গাইতেন? চাঁদ না থাকলে বাংলা গানের কী ক্ষতি হত বলুন তো?'

হেডস্যার ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার মিউজিক সিস্টেমের ভলিউম বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

আজ খুব গরম পড়েছে। সারাদিন মানুষজন হাঁসফাঁস করেছে খুব। তবে এখন এই শেষ বিকেলে গঙ্গার দিক থেকে সুন্দর হাওয়া বইছে। তমো জামার উপরের একটা বোতাম খুলে দিয়ে বলল, "দ্যাখ শান্টু, এমন করে কী মজা পাস তুই?"

"মজা নয় তো, রিভেঞ্জ।" শান্টু চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, "আমার সঙ্গে যারা-যারা এমন দুশমনি করবে, তাদের সকলের অবস্থা খারাপ করে দেব আমি।"

"কী করবি তুই?" তমো জিজ্ঞেস করল।

শান্টু হাসল। তারপর পকেট থেকে একটা হোমিওপ্যাথির সরু, ফাঁকা শিশি আর কাঠি বের করে বলল, "দ্যাখ।"

"মানে? এটা কী?" তমো আশ্চর্য হল।

"দেখতে পাচ্ছিস না তুই? অন্ধ নাকি? শিশি আর কাঠি।"

তমো জিজ্ঞেস করল, "কী হবে এটা দিয়ে?"

I with CamScanner

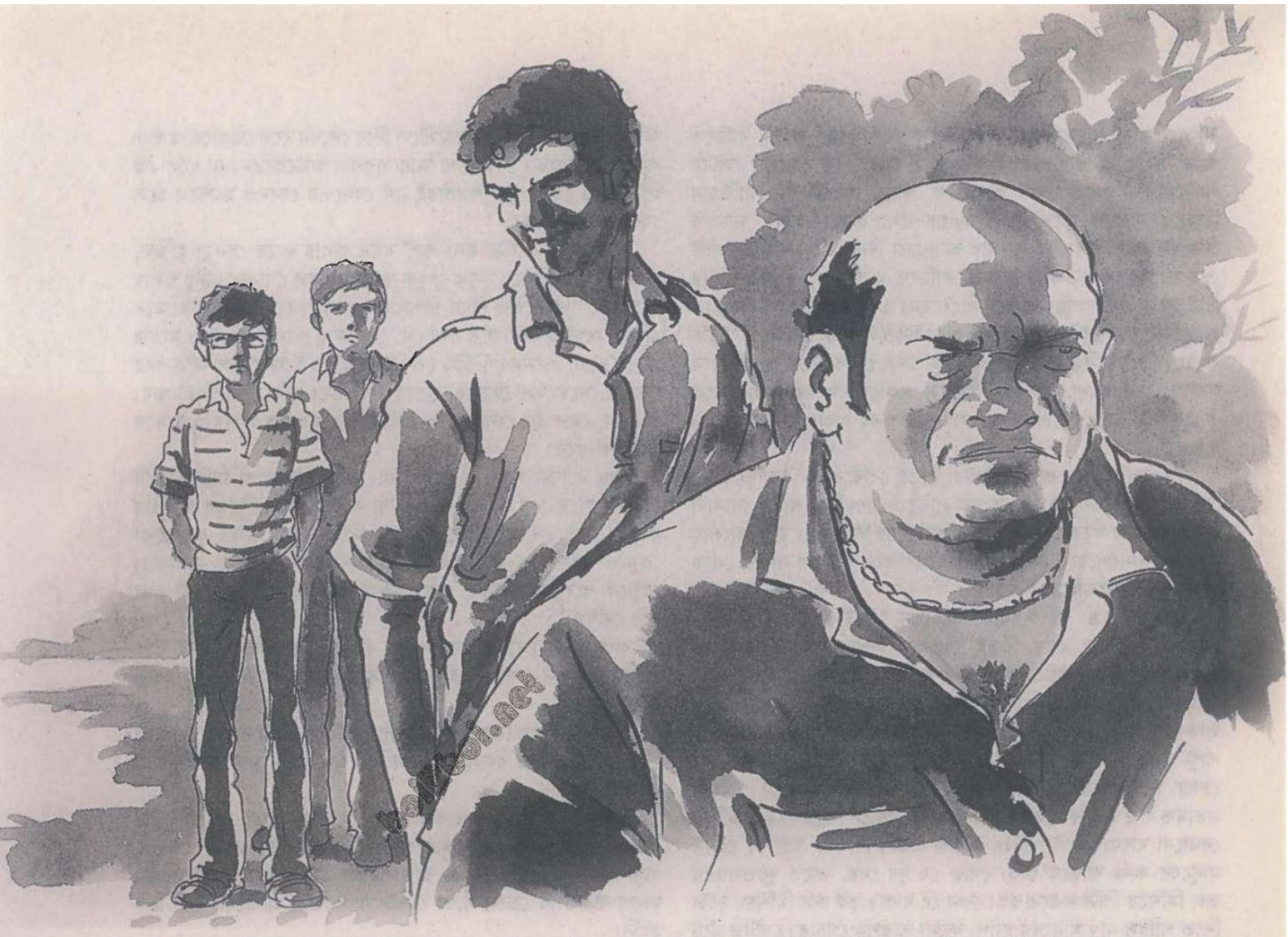

শান্টু হাসল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "বোমা মারব দ্বৈপায়নকে। তার জন্য বারুদ আনতে যাচ্ছি। চল, দেখতে পাবি।"

"বারুদ? মানে?" তমো অবাক হল।

"মানে দ্বৈপায়নের খুব তেল বেড়েছে। এবার ওকে এমন জব্দ করব না! আমি দেখেছি যে, প্রতিদিন থার্ড পিরিয়ডের পর ও একবার জল খেতে ক্লাস থেকে বেরোয় আর সিঁড়ির নিচ দিয়ে ঘুরে যায়। তখনই আমি সিঁড়ির উপর থেকে বোমাটা মারব।"

তমো অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বোমা মানে? তখন থেকে বোমা-বোমা করছিস। কেসটা কী বল তো?"

"পাথরগড়ের ঘণ্টাঘরটা দেখেছিস তো?" শান্টু জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। সেখানে কি বোমার গোডাউন আছে নাকি?"

"না, বারুদের। লাল পিঁপড়েদের যা একখানা কলোনি আছে না! দেখলে মনে হবে সব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাপোর্টার। সেখান থেকে পিঁপড়ে কালেক্ট করে এই শিশিতে নিয়ে আসব। তারপর কাগজে মুড়ে দ্বৈপায়নের কলারের কাছ দিয়ে জামার ভিতর গলিয়ে দেব। গেরিলা কায়দায় যখন সিঁড়ির উপর থেকে বোমা মারব, দেখব তখন কে ওকে বাঁচাতে আসে!"

তমো প্রায় আঁতকে উঠে বলল, "সর্বনাশ, এমন করবি তুই? এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ধরা পড়লে কিন্তু...!"

"অ্যাঁ!" সান্টু মুখ বাঁকাল, "ধরা পড়লেই হল! তাও তো ভিমরুল ছাড়ছি না।"

"মানে?" তমো আরও ঘাবড়ে গেল। ভাল ছেলেরা একটু বেশি ঘাবড়ে যায়।

"আরে, ঘণ্টাঘরের ওখানেই একটা ইয়াব্বড় ভিমরুলের চাক আছে। যদি একবার পিছনে পড়ে, চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে ছাড়বে, বুঝেছিস?"

রাস্তাটা এখান থেকে ঘুরে গিয়েছে গঙ্গার দিকে। দু' দিকে বাঁশঝাড় আর বড়-বড় ইউক্যালিপটাসের ভিড়। রেনট্রিও আছে কিছু। তার মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা প্রায় কাঁচুমাচু হয়েই গিয়েছে।

এই পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা খোলা মাঠে, যার এক কোণে ওই পাথরগড়।

মাঠ থেকে কেল্লা যাওয়ার ইটের পথটায় উঠে হঠাৎ থমকে গেল শান্টু। আরে, এরা কারা?

শান্টু দেখল, টি-শার্ট আর জিনস পরা একটি যুবক নেমে আসছে কেল্লার ভাঙা দেওয়াল বেয়ে, আর তার সামনে সাফারি সুট পরা মোটামতো একটা লোক।

শান্টু দাঁড়িয়ে দেখল, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে জিনস-পরা যুবকটি আর মোটা লোকটি ওর পাশ দিয়ে চলে গেল। যুবকটি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু মোটা লোকটি কোনও দিকেই তাকাল না। শান্টু শুধু লক্ষ করল, মোটা লোকটির গলায় চকচক করছে একটা ভারী সোনার চেন।

"কী ব্যাপার বল তো?" তমো কোমরে হাত দিয়ে ওদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেউ তো কোনওদিন এখানে আসে না। আর এরা তো নতুন লোক। এই অঞ্চলের নয়। কারা এরা?"

শান্টু ঠোঁট ওলটাল, "কে জানে! বাদ দে তো! হয়তো ঘুরতে এসে পাথরগড়ের নাম শুনে দেখতে এসেছে। ওর চেয়ে অনেক ইম্পর্ট্যান্ট ওই বোমা তৈরি। চল।"

তমো যেতে-যেতে অস্ফুটে বলল, "ব্যাপারটা ভাল লাগছে না শান্টু। জানি না কেন, কিন্তু মোটা লোকটাকে দেখে ভাল লাগছে না একদম।"

॥ ৪ ॥

মেঘটা যখন মাঝ গঙ্গায় তখনই তমো বাড়ি চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু শান্টু যায়নি। মেঘ দেখে অত ভয় পাওয়ার কী আছে? আর

Scanned with CamScanner

বাড়িতে গেলেও তো ভাল কিছু হওয়ার আশা নেই। কারণ, বাড়িতে আজ বাবার কাছে হেডস্যার বিমলদার হাত দিয়ে কমপ্লেন লেটার পাঠিয়েছেন। তাতে লেখা আছে যে, সায়ন্ত রায়চৌধুরীর গার্ডিয়ান হিসেবে বাবাকে স্কুলে দেখা করতে বলা হচ্ছে। কারণ, সায়ন্তর রেজাল্ট ক্রমশ খারাপ হচ্ছে আর অবাধ্যতা দিনকে দিন বাড়ছে। শান্টু তাই জানে যে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িতে বাবা চলে এসেছেন আর চিঠি হাতে পেয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়েছেন। বাবা এমনিতে না মারলেও আজ নির্ঘাত পেটানি খাবে ও। তা ছাড়া সকালে বাড়িতেও একটা দুষ্টুমি করেছে। পোষা বিড়ালটার লেজে কালিপটকা বেঁধে তাতে আগুন দিয়ে মামাতো দাদার ঘরে ছেড়ে দিয়েছিল সকালে। কারণ, সোনাদাকে একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিল ও। সেটাও নিশ্চয়ই বাবা জেনে গিয়েছেন এতক্ষণে।

গতকাল বাংলা ক্লাস টেস্টের খাতা বেরিয়েছিল। বাড়িতে না দেখিয়ে টিনটিনের বইয়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল শান্টু। সোনাদা ঠিক খুঁজে বের করে সেটা বাবার সামনে দিয়ে দিয়েছিল। ব্যস, বাংলায় কুড়িতে তিন পেয়েছে দেখে বাবা চিৎকার করে পঁয়ত্রিশ পাড়ার লোক জড়ো করে ফেলেছিলেন একদম।

আসলে এও যে স্যাররা দিয়েছেন, সেটাও হয়তো বেশিই দিয়েছেন। কারণ, প্রায় কিছুই লেখেনি শান্টু। দুর, বাংলাফাংলা একদম ফালতু লাগে। কোনও রসকষ নেই। শুধু উত্তর মুখস্থ করো আর লেখো। নিজের কেরামতি যদি না-ই দেখাল তো পড়াশোনা করে লাভ কী? তাই প্রথম তিনটে এক নম্বরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখে শান্টু বোর হয়ে গিয়ে বাকি প্রশ্নগুলোর আর উত্তর লেখেনি। বরং সোজা চলে গিয়েছিল আট নম্বরের রচনায়, 'গোরু সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও'। খুশি হয়েছিল শান্টু। যাক, এখানে নিজের ক্রিয়েটিভিটি দেখানো যাবে। ও লিখেছিল, 'গোরু একটা বিচ্ছিরি টাইপের প্রাণী। মানুষের কাজ বাড়িয়ে দেয়। গোরু যে দুধ দেয়, তাতে দুধওলাদের জল মিশিয়ে বিক্রি করতে হয়। কেন রে বাবা? তুই জল মিশিয়ে দুধটা দিতে পারিস না? মানুষের হ্যাপা কমে। তারপর গোবর! সেটাও ঘুঁটে হিসেবে দিতে পারে না? এখানেও কাজ বাড়ায়। গোরু 'হাম্বা' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না। এত হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে গোরু আছে, তবু হাম্বা ছাড়া তারা আর কোনও শব্দ শিখতে পারেনি। এ ছাড়াও গোরুর ভীষণ হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে। তাই তাকে মাঝেমধ্যেই গোরুখোঁজা খুঁজতে হয়। আর গল্পের বইয়ে গোরুরা হঠাৎ-হঠাৎ গাছে চড়ে বসে। কেন বসে, সে নিয়ে প্রশ্ন করলে অবশ্য হাম্বা ছাড়া তারা আর কোনও উত্তর দিতে পারে না। এত কারণের জন্য গোরুকে গালাগাল হিসেবে কিছু মানুষ ব্যবহার করে। তবে এটা তারা ভুলে যায় যে, রতনে রতন চেনে। পরিশেষে এটা অতি অবশ্যই বলতে হবে যে, সাদা-সাদা গোরুগুলোকে 'বলদ' আর কালো-কালো গোরুগুলোকে 'মহিষ' বলে।'

লেখাটা লিখে নিজেকেই নোবেল প্রাইজ় দিতে ইচ্ছে হয়েছিল শান্টুর। মনে হয়েছিল, ক্লাসের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে মাথা দুলিয়ে ভাব দিয়ে রিডিং পড়ে একচোট। তাই স্যারকে বলেছিল, 'স্যার, যা লিখেছি একটু পড়ব?'

'মানে?' স্যার ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, "কী পড়বি?"

'এই যে স্যার যা লিখেছি।'

'পরীক্ষা চলছে, আর পরীক্ষার খাতায় যা লিখেছিস তা তুই জোরে-জোরে পড়বি? মজা করছিস?'

'না স্যার, একদম দারুণ লিখেছি। অন্যরকম লিখেছি একদম। পড়ব?' শান্টু চশমা ঠিক করে উত্তেজিত হয়ে বলেছিল।

'চোপ,' স্যার চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'বোস, একদম চুপ করে বোস। বাংলায় তুই কী নতুন জিনিস লিখেছিস, হ্যাঁ? মেঘনাদবধ কাব্য?'

শান্টু গজগজ করতে-করতে বসে নিজের মনেই বলেছিল, 'দুর, ক্রিয়েটিভিটির কেউ দামই দেয় না।'

স্যার কিংবা বাবা, ক্রিয়েটিভিটির দাম কেউই দেননি। উলটে কিছুদিন আগে বাবা তো রীতিমতো হস্টেলে দিয়ে দেবেন বলে তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলেন। নেহাত মা আর ঠাকুরদা আটকেছেন। না হলে এই লখনসায়র ছেড়ে খুব শিগগিরই নর্থ বেঙ্গলের কোনও হস্টেলে চলে যেতে হত শান্টুকে।

বাংলার রেজাল্টের জন্য শান্টু যখন বাবার কাছে হেনস্থা হচ্ছিল, তখন দরজায় দাঁড়িয়ে ফুড়ুক-ফুড়ুক করে হাসছিল সোনাদা। নিচু গলায় বলেছিল, 'তুই সত্যিই গোরু বিশারদ।' খুব রাগ হয়েছিল শান্টুর। মনে হচ্ছিল, তখনই ফাঁস করে দেয় যে, সোনাদার পকেট থেকে ও মহেন্দ্র হলের দু'টো সিনেমার টিকিট পেয়েছে। আরও ইচ্ছে হচ্ছিল ফাঁস করে দেয় যে, সন্ধেবেলা সোনাদা ছাদের উপর উঠে লুকিয়ে সিগারেট খায়। এ ছাড়া, মোবাইল ফোনে রাত একটার পর খুব নিচু গলায় কার সঙ্গে যেন গল্প করে!

কিন্তু বলেনি শান্টু। ও অমন নয়। সোনাদার মতো নালিশ করে বালিশ পেতে চায় না ও। বরং ও যা করবে, সেটা নিজের ক্ষমতায় করবে। তাই সোনাদার ঘরে বিড়াল দিয়ে অমন তাণ্ডব করেছিল। কোনও প্রমাণ না থাকলেও আন্দাজ করতে পেরেছিল সোনাদা। শান্টুকে বলেছিল, 'দ্যাখ, আজ পিসেমশাই আসুন, তোর কী হাল করি দেখিস।'

বাবাকে যে সোনাদা বলবে, সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত। সেই সঙ্গে আবার কমপ্লেন লেটারটা আজই এসেছে। সত্যি, আজ শান্টুর একটা ফাঁড়া আছে।

পিঙ্কাদার দোকানের শেডের তলায় দাঁড়িয়ে তমো বলল, "দেখলি তো, তখনই যেতে বললাম, গেলি না। আর এখন মাঝপথে বৃষ্টিতে ভেজ।"

শান্টু আকাশের দিকে তাকাল। কালো ধোঁয়ার মতো মেঘ গাদাগাদি করে ভর্তি করে রেখেছে আকাশটাকে, আর জমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। এ বছর তেমন ঝড়-বৃষ্টি হয়নি। অফিশিয়ালি এটাই প্রথম কালবৈশাখী। মাঝগঙ্গার উপর ভেসে থাকা মেঘটাকে আন্ডার এস্টিমেট করা ঠিক হয়নি।

তমো আবার বলল, "আচ্ছা শান্টু, সব সময় এমন গন্ডগোল করিস কেন বল তো? কারও কথা শুনিস না কেন?"

"কোথায় শুনি না? এই তো, তোর কথা এখন শুনছি না?" শান্টু পকেট থেকে একটা চকোলেট বের করে মুখে পুরল। তারপর একটা তমোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "মাথা গরম করিস না। এই নে, চকোলেট খা। আজ গাবদুটা খুব ভিজবে রে!"

"দ্যাখ শান্টু, ওসব দিয়ে আমায় ভোলাস না। এই বৃষ্টিতে ভিজলে জানিসই তো আমার জ্বর হবে। ফালতু কেন এমন করে আটকালি? মা খুব বকবেন।"

শান্টু জানে তমো এমনই। টিপিক্যাল গুড বয়। নিয়ম মতো পড়াশোনা করে। মা-বাবার শাসন মানে। শুক্তো খায়। সিনেমা দেখে না। চুলে স্পাইক করে না। বৃষ্টিতে ভিজলে নিয়ম মতো টনসিলাইটিস আর জ্বরে ভোগে। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। শান্টু এসবের সম্পূর্ণ উলটো। তবুও কী করে যে ওদের বন্ধুত্ব হল!

শান্টু কথা ঘোরাতে বলল, "হ্যা রে, নাইনের সঙ্গে ম্যাচটায় কি আমাকে টিমে রাখবে?"

"কোন ম্যাচটায়?" তমো জিজ্ঞেস করল।

"আরে, ক্রিকেট ম্যাচটায় রে। টিমে রাখবে আমাকে?"

"তা আমি জানি না," তমো ব্যাজার মুখে বলল, "আচ্ছা, এর আগে কোনওদিন তুই টিমে চান্স পেয়েছিস যে আজ পাবি?"

শান্টু গম্ভীর হয়ে গেল, "তা পাইনি। কিন্তু অত্রির তো শরীর খারাপ। তাই ভাবলাম, ওর বদলে যদি আমাকে নেয়। আসলে দ্বৈপায়নকে যতক্ষণ না মজা দেখাতে পারছি, আমার ভাত হজম হচ্ছে না।"

তমো বলল, "সত্যি, তোর শিক্ষা হয় না। মনে নেই সেদিনের কথা? এর মধ্যেই ভুলে গেলি?"

শান্টু মাথা নিচু করল। সত্যি সেই পিঁপড়ে-বোমার প্ল্যানটা পুরো ফ্লপ করেছে। আসলে কাঠি দিয়ে পিঁপড়ে তুলে শিশিতে ভরতেই

Scanned with CamScanner

পারেনি। প্রথমে কয়েকটা পেরেছিল, কিন্তু তারপর শ'য়ে-শ'য়ে পিঁপড়ে আক্রমণ করেছিল শান্টুকে। দু'টো হাত আর পা একদম ফুলিয়ে লাল করে দিয়েছিল। কোনওক্রমে দৌড়ে গঙ্গায় লাফিয়ে নিজেকে রক্ষা করেছিল। আসলে ঘণ্টাঘরের কাছে কখনও বিশেষ যায়নি তো। তাই পিঁপড়ের বাসা আছে জানলেও অবস্থাটা যে এতটা ভয়াবহ তা বুঝতে পারেনি। তাই দ্বৈপায়নকে টাইট দেওয়াটা আর হয়ে উঠেনি।

তমো বলল, "দ্বৈপায়নকে টাইট দেওয়ার জন্য না খেলে, শুধু খেলার জন্য খেললে ভাল হয় না?"

শান্টু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "দ্যাখ তমো, ওকে যতক্ষণ না আমি শায়েস্তা করছি, আমি কিছুতেই মন দিতে পারব না।"

তমো আরও কিছু বলত। কিন্তু হঠাৎ দেখল, মালিদা মাথায় একটা ছাতা দিয়ে আর হাতে একটা ইয়াব্বড় ছাতা নিয়ে দৌড়ে-দৌড়ে আসছে। এই রে, খুঁজতে বেরিয়েছে নিশ্চয়ই শান্টুকে।

শান্টু চাপা গলায় তমোকে বলল, "খবরদার, বলবি না আমরা পাথরগড়ে গিয়েছিলাম। বাড়ির কেউ জানেন না যে, আমি ওখানে যাই। বলবি, আমরা অত্রিকে দেখতে ওর বাড়ি গিয়েছিলাম।"

তমো মাথা নেড়ে "হ্যাঁ," বলতে-বলতে হইহই করে মালিদা চলে এল, "আরে শান্টুদাদা, তুমি কোথায়? তোমার জন্য তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে। বড়বাবুর শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। আর তখন থেকে উনি কেবল তোমায় খুঁজছেন। কোথায় ছিলে তুমি?"

"ঠাকুরদার শরীর খারাপ করেছে? কখন? আমি তো ঠিকই দেখে এলাম!" শান্টু বেশ ঘাবড়ে গেল।

"দু'জন লোক এসেছিল। তারা কথা বলে চলে যাওয়ার কিছু পরেই বড়বাবু হঠাৎ তোমার খোঁজ করতে-করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তুমি চলো তাড়াতাড়ি। এই নাও, তোমার জন্য বড় ছাতা এনেছি।"

"কারা এসেছিল দেখা করতে?" তমো জিজ্ঞেস করল।

"আমি চিনি না। দু'জন এসেছিল। এই অঞ্চলের নয়।" মালিদা বড় ছাতাটা খুলে ওদের হাতে দিল, "চলো তাড়াতাড়ি, আর কথা নয়।"

শান্টুরা ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির পথে পা রাখল। ঠিক তখনই মালিদা অনেকটা নিজের মনেই বলল, "তবে একজনের গলায় ইয়া মোটা একটা সোনার চেন আছে।"

সোনার চেন? শান্টু আর তমো দু'জনে দু'জনের দিকে তাকাল। তা হলে কি ওই লোক দু'টোই নাকি? সেদিন ওই লোক দু'টো পাথরগড়ে এসেছিল। আবার ওদের বাড়িতেও গিয়েছিল? কেন? কী দরকার ওদের? শান্টু দেখল, বৃষ্টির তোড়ে সামনের রাস্তাটা রহস্য গল্পের মতো আবছা হয়ে আছে।

॥ ৫ ॥

"আপনি আম খান না?" আজও অয়নাঙ্ক বারান্দায় বসে আছেন। হাতে আমের প্লেট।

শ্রবণ হাসল, "খাই, তবে আপনার মতো নয়।"

অয়নাঙ্ক হাসলেন। তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে বললেন, "আপনার তো হরিধন রায়চৌধুরীর বাড়িতে যাতায়াত আছে, আমাকে একটু পারসোনালি দেখা করিয়ে দিন না।"

"ওই বাড়িতে যাতায়াত আছে মানে?" শ্রবণ সতর্ক হল, "আপনি জানেন যে আমার ওই বাড়িতে যাতায়াত আছে?"

"হ্যাঁ," অয়নাঙ্ক আমের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে জড়ানো গলায় বললেন, "থাকবে না? আপনারা পাথরগড় কিনে রিসর্ট বানাবেন। তার জন্য রায়চৌধুরীদের সঙ্গে তো যোগাযোগ রাখতেই হবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? তা কেমন মানুষ এই হরিধনবাবু? ওঁকে ধরলে ছেলে গলবে? ইটভাঁটা তো ওঁর ছেলে সুশ্রুতবাবুই দেখেন। বুঝতে পারছেন তো ভাই, বিক্রির উপর কমিশন আছে আমার। না বিক্রি করতে পারলে আম কেন, আমলকীও খেতে পারব না।"

শ্রবণ হাসল। যতক্ষণ এই বারান্দায় থাকবে, হাবিজাবি কথা বলেই যাবেন লোকটি। ও উঠল। বলল, "আপনি বসুন। আমার কয়েকটা জরুরি ই-মেল করার আছে, আমি ঘরে যাচ্ছি।"

"তা যান, তবে...," অয়নাঙ্ক হাসলেন, "এখানে আমার ফ্লাই অ্যাশ বিক্রি হচ্ছে না। আপনারাও রিসর্টের জন্য ওই কেল্লাটা পাবেন না।"

"মানে?" শ্রবণ চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল।

"আরে, কেল্লায় নাকি লক্ষ্মণ সেনের আমলের গুপ্তধন আছে। কেউ কি এই জিনিস হাতছাড়া করে? ওই ধ্বংসস্তূপের জন্য আপনারা খুব বেশি হলে এক কোটি টাকা দেবেন। কিন্তু ওখানে এমন গুপ্তধন আছে, যার দাম কোটি-কোটি টাকা। ফলে ভুলে যান ওসব রিসর্ট-ফিসর্ট।"

"কী বলছেন কী? গুপ্তধন?" শ্রবণ হাসল, "অমন সব পুরনো কেল্লার সঙ্গেই একটা না-একটা লেজেন্ড-এর লেজ থাকে। তা বলে সত্যি নাকি?"

"জানি না মশাই। শুনলাম, ওই কেল্লাটা কেনার জন্য সামনের সপ্তাহে বিদেশি এক কোম্পানি অনেক টাকার অফার নিয়ে আসছে। ওরাও ফ্যামিলি ডেস্টিনেশন বা রিসর্টই বানাবে। তাই বলছি, ফালতু চেষ্টা করছেন আপনি।"

শ্রবণ আর কথা বাড়াল না। নিজের ঘরে চলে এল। লোকটার সামনে কোনওরকম উত্তেজনা দেখানো ঠিক হবে না।

পুনিত একটা কালো ব্যাগ খুলে তার ভিতরে রাখা চারপেয়ে একটা যন্ত্র পরিষ্কার করছিল। শ্রবণকে দেখে বলল, "ডেটনেটরটার চার্জ কমে যাচ্ছে। ব্যাটারিটা খুলে রাখব?"

শ্রবণ বিরক্তির সঙ্গে বলল, "দিনের বেলায় এসব দোকানপাট খুলে বসেছ কেন? বন্ধ করো বলছি। তোমার কি বুদ্ধি হবে না কোনওদিন?"

পুনিত থতমত খেয়ে কালো ব্যাগটার ডালাটা বন্ধ করে দিল। বলল, "এখানে বসেই শুনছিলাম, ওই মোটা আম-খাওয়া লোকটা তোমার সঙ্গে বকবক করছিল। কী বলছিল কী?"

শ্রবণ বলল, "যা বলছিল তা যথেষ্ট চিন্তার। লোকটা বলছিল, কেল্লায় গুপ্তধনের কথা।"

"মানে?" পুনিত প্রায় লাফ দিয়ে উঠল।

"মানেটা কি ডিকশনারি খুলে বোঝাব? কেল্লায় যে লক্ষ্মণ সেনের গুপ্তধন আছে, ব্যাটা সেটা জানে।"

"তো? এখন কী হবে?" পুনিত ঠোঁট চাটল কয়েকবার। চোখ পিটপিট করল। তারপর বলল, "ব্যাটাকে চুপ করিয়ে দেব জন্মের মতো?"

"আঃ, আবার বোকার মতো কথা?" শ্রবণ বিরক্ত হল, "কথাটা নাকি অনেকেই জানে। তুমি কি সকলকে চুপ করাবে নাকি? সব সময় গা-জোয়ারি না করলে হয় না তোমার? আশ্চর্য! তবে একটা নতুন খবর দিল। সেটাই আসল চিন্তার।"

"কী খবর?" পুনিতের মোটা শরীরটা ঘামছে টেনশনে।

"সামনের সপ্তাহে বিদেশি কোম্পানির লোকজন পাথরগড় কিনে রিসর্ট বানাবে বলে এখানে আসছে। আমরা যে ছদ্মপরিচয় নিয়েছি, সেটা নিয়েই সত্যি লোকজন আসছে।"

"কিন্তু তোমার ওই বিদেশি এজেন্ট ভদ্রলোক তো এ ব্যাপারে কিচ্ছু বলল না।"

"আরে, সে আমাদের থেকে জিনিস কিনবে। তার জন্য যা টাকা দেওয়ার সেটা দেবে। সারা পৃথিবীতে কোন কোম্পানি কোথায় কী করছে তার হিসেব নিতে লোকটার বয়ে গিয়েছে। সে টাকাও দেবে আবার টেনশনও নেবে, হয় নাকি?"

"তা হলে?" পুনিতের চোখ গোল হয়ে উঠল, "আর হরিধন রায়চৌধুরীও তো সেদিন কিছু বলতে পারলেন না। এখন কী হবে?"

শ্রবণ ছোট্ট পদ্যটা বের করল আবার। ভাবল, স্যারের থেকে পুরোটা না জেনে অমন হঠকারীর মতো স্যারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। অবশ্য বেঁচে থাকলেও স্যার বলতেন কি না সন্দেহ।

হরিধনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে শ্রবণ, স্যারের, মানে সাত্যকি গুহর পরিচয়টাকেই অবলম্বন করেছিল।

Scanned with CamScanner

হরিধনের বয়স হয়েছে এখন। প্রায় পঁচাত্তর। শরীরও ভাল নেই। শ্রবণ আগেই জানত যে, ভদ্রলোক হাইপারটেনশনের রুগি, মানসিক চাপ খুব একটা নিতে পারেন না।

বিকেলটা থম মেরে ছিল একদম। দূর থেকে কালো মেঘগুলো দঙ্গল বেঁধে আসছিল লখনসায়রের দিকে। শ্রবণ পুনিতকে নিয়ে যখন রায়চৌধুরী বাড়িতে পৌঁছেছিল, হরিধন বাগানের পাশের বিশাল বারান্দাটায় বসে মোটা একটা ইংরেজি বই পড়ছিলেন। শ্রবণকে দেখে বলেছিলেন, 'ও, আপনিই সকালে টেলিফোন করেছিলেন? ঠিক আছে। আসুন, স্টাডিতে গিয়ে বসি।'

স্টাডিতে যাওয়ার পথে বারান্দা ও বাগানে সাজানো খুব সুন্দর কিছু মূর্তি দেখেছিল শ্রবণ। হরিধন বলেছিলেন, এগুলো ওঁর ছোটকাকা স্বর্গীয় দুর্লভকান্তির তৈরি। উনি নামী ভাস্কর ছিলেন।

স্টাডিতে গিয়ে বসার আগে শ্রবণ খুব বিনীতভাবে ঝুঁকে প্রণাম করেছিল হরিধনকে। হরিধন সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলেন, 'আরে-আরে, করেন কী? আপনি এভাবে...।'

শ্রবণ বলেছিল, 'আপনি আমার স্যারের বন্ধু। আপনাকে প্রণাম করার অধিকার আমার আছে। স্যারের কাছে কত গল্প শুনেছি আপনার। মৃত্যুর আগে স্যার আমাকে আপনার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, আপনাকে যেন আমি সতর্ক ও সাহায্য করি।'

'সতর্ক?' হরিধনের ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল সামান্য।

'বলছি, তার আগে আমার পরিচয়টা ভাল করে দিই!' শ্রবণ পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে হরিধনের সামনে ধরে আবার পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ। চারদিকে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক বস্তুর চুরি বেড়ে গিয়েছে, তাই আমাদের সতর্ক থাকতেই হয়। স্যারের মৃত্যুর আগে আমাকে উনি বলেছিলেন যে, এই লখনসায়রের কেল্লায় নাকি গুপ্তধন আছে। গুপ্তধন মানে শুধু হিরে-জহরত নয়, তার চেয়েও দামি একটা জিনিস। আর তার সূত্র বা চাবিকাঠি নাকি আপনার কাছে আছে। আপনি জানেন কেল্লায় কোথায় সেটা আছে?'

'আমি?' হরিধনের গলাটা দুর্বল শুনিয়েছিল, 'হ্যাঁ, সতু বলেছিল বটে যে, আমাদের এখানে যা আছে তাতে ডাকাত পড়ল বলে! কিন্তু আমি তো জানি না কিছু।'

শ্রবণ গুছিয়ে বসে বলেছিল, 'লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ থেকে বখতিয়ার খলজির আক্রমণে পালিয়ে কয়েকটা জায়গা ঘুরে এই গঙ্গার পারে আপনার পূর্বপুরুষদের কাছে এসেছিলেন। এখানে আপনার পূর্বপুরুষরা তাঁকে আশ্রয় দেন। উনি আপনার পূর্বপুরুষদের কাছে খুব মূল্যবান কিছু গচ্ছিত রেখে যান। আর বলেন যে, সময় মতো ফিরে এসে নিয়ে যাবেন। সেটা বারোশো দুই খ্রিস্টাব্দ। তারপর আরও চার বছর বেঁচেছিলেন লক্ষ্মণ সেন। বারোশো ছ'য়ে তিনি মারা যান। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক উনি আর লখনসায়রে ফিরে আসেননি। আপনাদের পূর্বপুরুষদের কাছে সেটা রয়ে যায়। এবং সেটা সুলতানি আমলে আর ইংরেজ আমলে যাতে শত্রুর খপ্পরে না পড়ে তার জন্য লুকিয়ে রাখা হয়।

'আপনার যখন চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স, তখন আপনার ছোটকাকা দুর্লভকান্তি মূল্যবান জিনিসটি কেল্লার ভিতরে খুঁজে পান এবং বাড়ির কেউ যাতে লোভে পড়ে তা বিক্রি না করে দেন সেজন্য কেল্লার ভিতরেই অন্য এক জায়গায় তা পুঁতে রাখেন। আর, কোথায় রাখেন সেটা একটা পদ্যের মধ্যে সংকেত আকারে লিখে যান। স্যার এখানে আপনাদের পুরনো কাগজপত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দুর্লভকান্তির ডায়েরি আর তার সঙ্গে ওই সংকেতও খুঁজে পান। আর সেটাই হয় কাল।'

'কাল? মানে?' হরিধন ঘামতে শুরু করেছিলেন।

'স্যারের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। বিষ প্রয়োগ হয়েছে। আর যারা করেছে তারা সেই ডায়েরি ও সংকেতটা হাতিয়ে নিয়েছে।'

'কী? সতুকে মেরে ফেলেছে?' হরিধন ঘামছিলেন খুব, মুখ-চোখ লাল হয়েছিল ওঁর।

'কিন্তু আমি যে জানলাম সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। হাইপ্রেশারের রুগি ছিল সতু। তো সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়নি?'

'এখনকার দিনে এমন অনেক বিষ পাওয়া যায় যা মৃত্যুকে হার্ট অ্যাটাক বা সেরিব্রাল অ্যাটাক হিসেবে চালাতে পারে। আর সেই বিষ কাজ করার পর শরীরে তার চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। তবে স্যার বুঝতে পেরেছিলেন যে, অমন কিছু একটা হতে পারে। তাই আমাকে ডেকে আপনাকে সতর্ক করার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন যে, হরির কাছে এর সূত্র আছে।'

'কিন্তু আমি কিচ্ছু জানি না।' হরিধন যে খুব ঘাবড়ে গিয়েছেন শ্রবণ বুঝেছিল।

ও বলেছিল, 'ভাল করে মনে করে দেখুন। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের ব্যাপার। দুর্লভকান্তি ওই সংকেত লেখার মাস দুয়েক পরেই মারা যান। তার আগে আপনাকে কিছু বলে গিয়েছিলেন? কোনও স্পেশ্যাল বা খুব সাধারণ কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন? মনে করুন।'

হরিধন টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে জল খেয়ে বলেছিলেন, 'না, কিচ্ছু না। হ্যাঁ, ছোটকা আমাকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু কিছু তো দেননি।'

'ভাল করে ভেবে বলুন। কারণ, আমাদের কাছে খবর আছে যে, যারা স্যারকে মেরেছে তারা আপনাকেও চাপ দেবে। আপনার নাতি শান্টুকে তারা কিডন্যাপ করতে পারে।'

'কিন্তু আমায়... আমায় কেন? শান্টু কী ক্ষতি করেছে তাদের?' হরিধন কাঁপছিলেন।

'যারা আসবে তারা রুথলেস। নিজেদের কাজ বাগাবার জন্য সব করতে পারে। স্যার আমাকে বলেছিলেন যে, এই সংকেতের ভিতরে নাকি আপনার নাম আছে। তাই আমাকে বলে দিন এইবেলা।'

'আরে, জানলে তো বলব!' হরিধন বিব্রত মুখে তাকিয়েছিলেন শ্রবণের দিকে।

শ্রবণ বলেছিল, 'ঠিক আছে, আপনি ভাবুন ভাল করে। আর আমাদের এই ভিজিটটা গোপন রাখবেন। কেউ জানতে চাইলে বলবেন যে, আমরা আপনাদের কেল্লাটা কিনে সেখানে রিসর্ট বানাতে চাই বলে এসেছি, কেমন?'

হরিধন 'আচ্ছা,' বলে মাথা নেড়েছিলেন। শ্রবণ বুঝেছিল যে, মানুষটা নড়ে গিয়েছেন খুব।

পুনিত নিজের বিছানা থেকে নেমে এসে শ্রবণের বিছানায় বসল, "তো, কী করবে এখন? দু'-একদিনের ভিতরেই তো তা হলে কাজ হাসিল করে পালাতে হবে। তুমি সংকেতটার কিছু উদ্ধার করতে পারলে?"

শ্রবণ জবাব না দিয়ে আবার সংকেতটা খুলল।

'পাথরে পাথর ঢাকা/ঘোরে ভাগ্যের চাকা
ঘোরে কাল,কণ্টক/সময়ই তো দর্শক
জৈষ্ঠের মধ্যম/গৌতমে এক কম
পনেরোতে কম ছয়/সবুরে তো মেওয়া হয়
নয়তম রক্তিম/সূর্যটি পশ্চিম
শঙ্খের পেটে পা/আরও নয় নীচে হাঁট
সব চেতনার ধন/গদাধর ভগ্‌বন্‌
গদা শেষ চেতনা/না হলে তো পেত না
অবতার লিখে যায়/হরি ধন সামলায়
খুঁজে পেলে গড়তে/যাবে সব বর্তে
পাথরের কেল্লার/বেড়ে যাবে জেল্লা।'

শ্রবণ নিজের মনেই বলল, "অনেকটাই পেয়েছি। কিন্তু সবটা নয়। যেমন কণ্টক, চেতনা, অবতার আর হরিধন। হরিধনবাবু বলছেন উনি জানেন না। নাতির ভয় দেখালেও বলছেন, জানেন না। তা হলে কে জানে? হরিধনকে কী সামলাতে বলা হচ্ছে? আর-একটা জিনিস মিসিং মনে হচ্ছে। লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব ছিলেন। বিষ্ণুর উপাসক। কিন্তু একটা জিনিস মিসিং। অঙ্কটা হয়ে-হয়েও যেন মিলছে না।"

Scanned with CamScanner

পুনিত বলল, "তুমিও পারছ না?"

"না, পারছি না। তবে পারতে হবেই। অনেক টাকার ব্যাপার। অনেক টাকা।"

পুনিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল, "ও হরি, আমি ভাবলাম হয়ে যাবে সহজে।"

"কী বললে?" শ্রবণ চট করে উঠে দাঁড়াল।

"আমি আবার কী বললাম?" পুনিত ঘাবড়ে গেল।

"বৈষ্ণব। বিষ্ণু। বিষ্ণুর উপাসক।" শ্রবণ একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে?" পুনিত জিজ্ঞেস করল।

"তুমি আম খাও?" শ্রবণ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল পুনিতকে।

"আম?" পুনিত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"হ্যাঁ, এখানকার আম খুব বিখ্যাত।"

"কিন্তু আমার ভাল লাগে না।" পুনিত নাক কোঁচকাল।

"তবু গিয়ে খাও। আমাকে একা থাকতে দাও একটু। একা থাকা খুব দরকার এখন।"

॥ ৬ ॥

অত্রি খেলতে পারবে না, তবু ওকে নিল না টিমে? স্কুলে আসার পর থেকেই শান্টুর মাথাটা গরম হয়েছিল। ও তাই সোজা গিয়েছিল ইহিতের কাছে। ইহিত ওদের ক্লাস টিমের ক্যাপ্টেন। ভাল ব্যাট করে।

স্কুল কম্পাউন্ডে যে বড় দেবদারু বীথিটা রয়েছে তার নীচে দাঁড়িয়ে ইহিত তখন গল্প করছিল দ্বৈপায়নের সঙ্গে।

শান্টু গিয়ে ইহিতের জামার পিছনটা টেনে বলেছিল, "কী রে ইহিত, আমি টিমে নেই কেন রে?"

ইহিত ওর দিকে ঘুরে বলেছিল, "দ্যাখ সায়ন্ত, তোর ক্রিকেটটা ঠিক আসে না। তাই টিমে নেই।"

"জানিস না আমার হাতের টিপ খুব ভাল। আর আমার ক্রিকেট আসে না?" শান্টু এমন অবাক মুখ করে তাকিয়েছিল যেন সচিন ব্যাটিং ঠিক পারে না এমন কথা বলে ফেলেছে ইহিত।

এবার ইহিত কিছু বলার আগেই দ্বৈপায়ন শুরু করেছিল, "আরে, ইহিত তো ভাল করে বলছে। আসলে তুই ব্যাটের সোজা-উলটো বুঝিস না। বল গোল না তিন কোনা, জানিস? আর ফিল্ডিং? সে তো ফুটো কোম্পানি! তুই খেলবি কী রে? আর টিপ ভাল তো আম পাড় গিয়ে। তোদের তো বড় আমের বাগান রয়েছে। যা সেখানে।"

"তবে রে...!" শান্টু প্রায় লাফিয়ে পড়তে গিয়েছিল দ্বৈপায়নের গায়ে, কিন্তু পারেনি। পিছন থেকে একটা সবল হাত ওকে ধরে ফেলেছিল।

"কে রে?" শান্টু রাগের চোটে ঘুরেই বাংলাস্যারকে দেখে থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

বাংলাস্যার ভূষণবাবু ইয়া লম্বা-চওড়া। পাঁকানো গোঁফ। টিফিনে কুড়িটা রুটি আর চারটে ডিম সেদ্ধ খান। টুয়েল্‌ভের ছেলেদের পর্যন্ত এক হাতে মাটি থেকে তুলে ফেলেন।

ভূষণবাবু ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "আমি। কেন?"

শান্টু গজগজ করতে-করতে বলেছিল, "স্যার, ওই দ্বৈপায়ন আমাকে যা-তা বলেছে।"

"বেশ করেছে!" ভূষণবাবু হুঙ্কার দিলেন, "যা, ক্লাসে যা। মারামারি ছাড়া আর কিছু পারিস?"

Scanned with CamScanner

শান্টু মাথা নামিয়ে ক্লাসের দিকে হাঁটা দিল। তবে যেতে-যেতে একবার আড় চোখে দ্বৈপায়নকে দেখে ভাবল, আমি না খেললে তুই কী করে খেলিস আমি দেখব।

দ্বৈপায়নরা প্রথমে ব্যাট করল। পনেরো ওভারে ছ' উইকেট জলাঞ্জলি দিয়ে ওরা একশো আট রান করল, তাতে দ্বৈপায়ন একাই পঁয়তাল্লিশ। কলার তুলে মাঠ থেকে বেরোতে-বেরোতে দ্বৈপায়ন শান্টুর সামনে বলল, "দেখলি তো, একেই বলে ক্রিকেট। বানান কর তো?"

বানান? তক্কে-তক্কে ছিল শান্টু। ওদের টিম ব্যাট করতে নামার সময় শান্টু ভাবছিল কীভাবে দ্বৈপায়নকে টাইট দেওয়া যায়। কিন্তু দ্বৈপায়ন ক্যাপ্টেন, সব সময় বোলারের কাছে মিড অন বা অফ, অথবা স্লিপে দাঁড়াচ্ছিল। নাগাল পাচ্ছিল না। তাই কীভাবে টাইট দেবে বুঝতে পারছিল না শান্টু। এদিকে ক্লাস সেভেনের ব্যাটসম্যানরা আয়ারাম-গয়ারামের মতো মিছিল করে যাচ্ছিল আর আসছিল। আর সেই দেখে দ্বৈপায়ন চিৎকার করে বলল, "কী রে, তোদের আজ শান্টু-এফেক্ট চলছে নাকি?"

শান্টু আর নিতে পারল না। ওদের প্লেয়ারদের জায়গা ছেড়ে গুটিগুটি এগিয়ে গেল বাউন্ডারি লাইনের দিকে। তারপর অপেক্ষায় রইল সুযোগের।

ধড়াধ্বড় সাত উইকেট পড়ে গেলেও ইহিত নীল বলে একটা ছেলেকে নিয়ে পালটা মার শুরু করল তারপর। ফ্লিক করে দু' রান। পুলে তিন। স্কোয়ার কাট-এ চার। ক্রমশ রান বাড়ছিল। আর দ্বৈপায়ন টেনশনে ওদের টিমের প্লেয়ারদের উপর রাগারাগি শুরু করে দিল। বলল, জোরে বল, আরও জোরে বল করতে।

খেলা যত গড়াচ্ছিল, টেনশনও বাড়ছিল। কিন্তু শান্টুর সুযোগ আসছিল না কিছুতেই। ও ভাবছিল, তবে কি সুযোগ আসবে না? তবে কি দ্বৈপায়ন শয়তানি করেও পার পেয়ে যাবে? আর ঠিক তখনই হঠাৎ সুযোগটা এল।

দশম ওভারের দ্বিতীয় বলটায় ইহিত ফ্রন্টফুটে গিয়ে মিড অফ আর এক্সট্রা কভারের ভিতর দিয়ে মাখনের মতো ড্রাইভ মারল। বলটা ব্যাটে লাগামাত্র বিদ্যুৎগতিতে মিড অফে দাঁড়ানো দ্বৈপায়নকে ফাঁকি দিয়ে ছুটছিল বাউন্ডারির দিকে। বলের পিছনে ছুটছিল দ্বৈপায়ন।

এই সুযোগটাই খুঁজছিল শান্টু। ক্লাস সিক্সের একটা ছেলে বলটা কুড়োতে যেতেই শান্টু লাফিয়ে, ওই ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তুলে নিল বলটা। তারপর হাতে নাচিয়ে খিকখিক করে হেসে দ্বৈপায়নকে বলল, "কী রে? আয়, বল নিবি আয়।"

"দে বলটা।" খুব বিরক্ত হয়ে বলল দ্বৈপায়ন।

"হিম্মত থাকলে আমার হাত থেকে নে।" শান্টু ভুরু কুঁচকে বলল।

"তবে রে...!" দ্বৈপায়ন দৌড়ে এল শান্টুর দিকে।

ঠিক সেই সুযোগেই শান্টু আচমকা গায়ের জোরে ডিউস বলটা ছুড়ে মারল দ্বৈপায়নকে লক্ষ করে। বলল, "নে, ধর।"

দ্বৈপায়ন এটা আশা করেনি। ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখল যে, একটা লাল বল খুব কাছ থেকে ধাঁ করে আসছে ওর দিকে। না, নিজেকে সরাতে পারল না দ্বৈপায়ন। শুধু দু'টো হাত দিয়ে আড়াল করল মুখটা। বলটা শাঁই করে গিয়ে আছড়ে পড়ল দ্বৈপায়নের মাথায়।

"ওরে বাবা রে, আমায় মেরে ফেলল রে। ও মা গো। বাঁচাও।" দ্বৈপায়ন চিৎকার করে মাথা চেপে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল মাটিতে। আশপাশ থেকে সবাই দৌড়ে এল।

গেমসটিচার হাতের বেতটা উঁচিয়ে, "ফাউল, ফাউল, সরি হিট উইকেট, এল বি!" চিৎকার করতে-করতে দৌড়ে এলেন ওদের কাছে। খেলা দেখতে-আসা ভূষণবাবু ঘটোৎকচের মতো লাফিয়ে পড়ে দু' হাত দিয়ে জাপটে ধরতে গেলেন শান্টুকে। আর এসবের মাঝে শান্টু বেগতিক দেখে স্যারের পায়ের ফাঁক গলে, ছাত্রদের মাথা টপকে, স্কুলের ছোট্ট পাঁচিল পেরিয়ে গিয়ে উঠে পড়ল সবুজ সাইকেলে। তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে চোঁ-চোঁ চালিয়ে দিল সামনে।

ওর ভয় করছিল। ছোড়ার সময় অত ভাবেনি। কিন্তু তারপর ভেবেছিল, অমন ইটের মতো একটা বল লাগলে যদি মাথা ফেটে যায়? যদি দ্বৈপায়ন জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে? সেই জ্ঞান যদি আর না ফেরে? তা হলে? তা হলে কী হবে? স্কুল আর বাড়ি, দু' জায়গা থেকেই তো ওকে উচ্ছেদ হতে হবে!

সেই পালিয়ে এসে এই কেল্লার দেওয়ালের পাশ ঘেঁষে তখন থেকে গাবদুকে নিয়ে বসে আছে শান্টু। আর যত সময় যাচ্ছে, তত ভয় বাড়ছে শান্টুর। কে জানে এতক্ষণে কী হয়েছে? দ্বৈপায়ন ঠিক আছে তো?

ঠিক তখনই দৃশ্যটা চোখে পড়ল শান্টুর। দু'জন লোক কেল্লায় ঢোকার ইটের পথ ধরে এগিয়ে আসছে। একজনের হাতে কিছু নেই, কিন্তু অন্যজনের হাতে একটা ঢাউস ব্যাগ। নিমেষে চিনতে পারল শান্টু। আরে, সেই দুই মক্কেল না? এত বড় একটা ব্যাগ নিয়ে এখানে কী করছে? শান্টুর মনে হল, দু'জনের চালচলন যথেষ্ট সন্দেহজনক। কী চায় ওরা? এমন চোরের মতো চারদিক দেখে, এত সাবধানে কেন ঢুকল কেল্লায়? শান্টু চট করে উঠে সাইকেলটা ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে শুইয়ে নিজেও গাবদুকে নিয়ে লুকিয়ে পড়ল। শান্টুর মনে হল, দেখতে হবে, ভাল করে দেখতে হবে এই দু'জন কী চায় এখানে?

॥ ৭ ॥

বিকেল পাঁচটায়ও যখন শান্টু বাড়ি ফিরল না, তখন সকলের চিন্তা শুরু হল। মা ফোন করলেন বাবাকে। সোনা সাইকেল নিয়ে আশপাশের বাড়ি আর মাঠগুলো খুঁজে এল। আর হরিধন পায়চারি করতে লাগলেন লম্বা টানা বারান্দাটায়। কোথায় গেল শান্টু?

সোনা খবর নিয়ে এল, স্কুলে গন্ডগোল হয়েছে একটা। দ্বৈপায়ন বলে একটা ছেলেকে ডিউস বল দিয়ে মেরে শান্টু পালিয়েছে।

"পালিয়েছে?" হরিধন অবাক হলেন।

"হ্যাঁ, কিন্তু কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না।"

"জানে না মানে?" পিছন থেকে বলে উঠলেন শান্টুর বাবা সুশ্রুত।

"পিশেমশাই, তুমি অফিস থেকে এসে গিয়েছ?" সোনা পিছন ঘুরল।

"কিন্তু শান্টু কই? কোনও খবর পেলি না?" সুশ্রুতের মুখে গভীর চিন্তা। ছেলেটা যে ভারী দুষ্টু!

"স্কুলের তো কেউ কিছু বলতে পারল না। তা ছাড়া তমো সেদিন বৃষ্টিতে ভিজেছিল বলে জ্বরে পড়ে আছে। স্কুলে যেতে পারছে না কয়েকদিন।"

"এদিকে তোর পিসি তো কান্নাকাটি শুরু করেছে।" সুশ্রুত বারান্দার চেয়ারে বসে পড়লেন।

"তা হলে উপায়?" হরিধন মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালেন, "আমি জানতাম এমন একটা কিছু হবে। ওই শ্রবণ বলেছিল আমায়। কতবার তোদের বলি, ছেলেটাকে চোখে-চোখে রাখ। তোরা শুনিস আমার কথা? না হয় একটু দুষ্টুই, তা বলে এমন অবহেলা করতে হবে?"

সুশ্রুত উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, কী বলছ তুমি? শ্রবণ কে?"

হরিধন মাথা নিচু করে চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে লাগলেন।

"কী হল বাবা, বলছ না কেন? শ্রবণ কে? কী বলেছিল তোমায়?"

"সে অনেক কথা।" হরিধন চশমাটা পরলেন আবার, "বলছি, তার আগে সোনা, একবার তমোর বাড়িতে ফোন কর তো। দ্যাখ তো, ও জানে কি না শান্টু কোথায় যেতে পারে? এক্ষুনি খবর নে।"

সোনা পকেট থেকে মোবাইল বের করে তমোর বাড়ির নম্বর ডায়াল করল, "হ্যালো কাকিমা, আমি শান্টুর দাদা সোনা বলছি। তমো কেমন আছে? শুনেছিলাম জ্বর হয়েছে? ও, আর জ্বর নেই? বাঃ! একটু দেবেন প্লিজ। খুব দরকার। শান্টুকে আসলে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কে তমো? আচ্ছা, শান্টু কোথায় যেতে পারে বল তো? কোথায়? কেল্লায়? সে কী? তোরা কেল্লায় যাস নাকি? তুই শিওর? আচ্ছা, ঠিক আছে, তুই রেস্ট নে। আমি দেখছি।"

Scanned with CamScanner

সোনা বলল, "পিসেমশাই, ও পাথরগড়ে মানে কেল্লায় থাকতে পারে।"

"কেল্লায়?" সুশ্রুত অবাক হলেন, "ওটা তো সাপখোপের জায়গা। ওখানে যায় নাকি ও?" তারপর হরিধনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী সর্বনাশা ছেলে দেখেছ? আর তুমি কী বলছিলে বলো তো চটপট। শ্রবণ কে?"

হরিধন সময় নিলেন কয়েক সেকেন্ড, তারপর যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বললেন, সাত্যকি গুহ, শ্রবণ, গুপ্তধন, সংকেত, কেল্লা আর শান্টুর বিপদের কথা।

সুশ্রুত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন খানিক, তারপর বললেন, "এসব তুমি লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? আমায় বলবে তো! ব্যাপারটা এত দূর বাড়তই না।"

"মানে?" হরিধন অবাক হলেন।

"মানে?" সুশ্রুত দ্রুত মোবাইল বের করে একটা নম্বর ডায়াল করতে-করতে বললেন, "আমাকে একজন এমন আশঙ্কার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, এখনই কাউকে না জানাতে। উনি পুলিশের লোক। থানায় ওসি'র সামনে আমাদের কথা হয়েছিল। বলেছিলেন, সামান্য এদিক-ওদিক হলেই যেন ওঁকে খবর দিই। তুমি শ্রবণের কথা আমাকে প্রথমে বললে এত টেনশন এখন করতেই হত না।"

হরিধন কাঁপা গলায় বললেন, "কিন্তু দ্যাখ, আমি কিচ্ছু জানি না, আর আমারই এই বিপত্তি? এখন কী হবে বল তো?"

সুশ্রুত লাইনটা পেয়ে হাত দিয়ে হরিধনকে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন, তারপর বললেন, "হ্যালো, আমি সুশ্রুত রায়চৌধুরী বলছি। উনি আছেন? আচ্ছা, আচ্ছা, ধরছি।"

তারপর মোবাইলটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে হরিধনের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, "থানাতেই আছেন? মোবাইলটা রেখে পাশের ঘরে গিয়েছেন।"

হরিধন কিছু বলার আগেই সুশ্রুত আবার মোবাইলে কথা শুরু করলেন, "হ্যালো, আমি সুশ্রুত বলছি। একটা সমস্যা হয়েছে। শান্টু, মানে আমার ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে গেস করছি, কেল্লায় গিয়েছে। তা যদি একবার...। আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা বেরোচ্ছি। আপনারা ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছেন? গুড? আর ইয়ে..., কোনও সমস্যা, মানে রিস্ক নেই তো? ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, আমরা এক্ষুনি বেরোচ্ছি।"

মোবাইলটা রেখে সুশ্রুত বললেন, "চল সোনা, আর মালিকেও খবর দে। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।"

"কেন? কী হয়েছে?" হরিধন জিজ্ঞেস করলেন।

"তোমার শ্রবণ বাবাজি একটা যন্ত্র। ক্রিমিনাল। তোমাকে কী ও পুলিশ হিসেবে নিজের আই-কার্ড দেখিয়েছে?"

"আমাকে? হ্যাঁ, মানে... অবিশ্বাস করার তো কারণ দেখিনি। তার উপর সতুর ছাত্র বলল। আমি কী করে বুঝব বল তো?"

"সেই সুযোগটাই তো নিয়েছে। তোমাকে চাপ দিয়ে কথা বের করতে না পেরে হয়তো এখন শান্টুকে...।"

"বাজে কথা ভাবিস না!" হরিধন বললেন, "তা তুই কাকে ফোন করলি? তোকে কে আশঙ্কার কথা বলেছিলেন?"

"ডাকাতদাদুর মৃত্যুটা যে স্বাভাবিক নয় তা পুলিশ বুঝতে পেরে একজন অফিসারকে এখানে পাঠিয়েছে। উনি দেখা করেছেন আমার সঙ্গে। তবে এত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটবে ভাবেননি।"

"কে অফিসার? কী নাম?"

সুশ্রুত দরজার দিকে যেতে বললেন, "রায়, অয়নাঙ্ক রায়।"

॥ ৮ ॥

"পুরনো দিনের কেল্লা, তা এখনও এমন ভাল অবস্থায় আছে কী করে? এর তো মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা?"

পুনিতের প্রশ্নে শ্রবণ হাসল। কথাটা ওরও মনে হত, যদি না সাত্যকিস্যারের থেকে পুরোটা জানত।

ও বলল, "আঠারোশো সাতান্ন পর্যন্ত কেল্লাটার রক্ষণাবেক্ষণ ভালই হত। তারপর থেকে এর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। রায়চৌধুরীদের অবস্থা পড়ে যায়। টাকার অভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা আর সম্ভব হয় না। তাই এই অবস্থা।"

পুনিত আর প্রশ্ন না করে চারদিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "তা এখন খোঁজ শুরু করবে কি? চারদিকে তো কেউ নেই দেখছি।"

শ্রবণ বলল, "হ্যাঁ, এখনই করব।"

পুনিত কালো ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, "কিন্তু একটা কথা। তুমি শিওর যে, সংকেত উদ্ধার করেছ? আমার তো মনে হয় বুড়োটা সব জানে। হরিধনকে ভাল করে চেপে ধরলে ঠিক বলে দিত কোথায় গুপ্তধন লুকিয়েছে! তুমি একদিন গিয়ে কেমন যেন পাত্তা মেরে গেলে।"

শ্রবণ হাসল, "আরে বলছি তো পেয়ে যাব। সেদিন কেল্লায় এসে একটা জিনিস দেখেছিলাম, যা তখন বুঝিনি কিন্তু এখন বুঝতে পারছি। আর শেষ সূত্রটা তো তুমিই দিয়েছ।"

"আমিই?" পুনিত থতমত খেল।

শ্রবণ হাসল শুধু। সাত্যকি গুহ খুব ভালবাসতেন শ্রবণকে। কিন্তু এই ব্যাপারটায় কিছুতেই সাহায্য করেননি। বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রবণের লোভ আছে। কিন্তু পারলেন কি আটকাতে? না, পারেননি। কেউ পারবে না। আজ গুপ্তধন তুলে নিয়ে এখান থেকে চম্পট দেবে ও। কেউ ওর টিকির নাগালটাও পাবে না! তবে যা করতে হবে দ্রুত করতে হবে। ইটের তোরণটা পার হয়ে ওরা কেল্লার ভিতর ঢুকে পড়ল।

বিকেলের সূর্য ক্রমশ কমলা হচ্ছে এখন। নদীর পার ঘেঁষে নানারকম পাখিরা ওড়াউড়ি করছে। ওপারে ইটভাঁটার লম্বা চিমনিগুলোকে পাতাবিহীন তালগাছের মতো লাগছে। আর এসবের মধ্যে ঘোলাটে জল নিয়ে নদী ধীরে-ধীরে বয়ে যাচ্ছে দক্ষিণে। শ্রবণের খুব অদ্ভুত লাগল। এতদিন ধরে একটা ভাঙা কেল্লায় এমন সম্পদ পড়ে রইল আর কেউ তা জানল না? এসব কি তা হলে শ্রবণের জন্যই ছিল? ওই কি তা হলে এর যোগ্য উত্তরাধিকার?

"এবার?" কেল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল পুনিত।

শ্রবণ চোয়াল শক্ত করে বলল, "এবার ম্যাজিক। ক'টা বাজে?"

"এখন?" পুনিত শ্রবণের গলা শুনে ঘাবড়ে গেল, "পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। কেন?"

"আর দশ মিনিট।" শ্রবণ বলল।

"কী দশ মিনিট? একটু খুলে বলবে?" পুনিত কাতর গলায় বলল।

"বলছি," শ্রবণ হাসল, "এবার বলার সময় এসেছে। শোনো।"

পুনিত আগ্রহ নিয়ে চোখ গোল করে তাকাল শ্রবণের দিকে।

শ্রবণ বলল, "সংকেতের প্রথম পাঁচটা লাইন দ্যাখো:

'পাথরে পাথর ঢাকা/ঘোরে ভাগ্যের চাকা
ঘোরে কাল,কণ্টক/সময়ই তো দর্শক
জ্যৈষ্ঠের মধ্যম/গৌতমে এক কম
পনেরোতে কম ছয়/সবুরে তো মেওয়া হয়
নয়তম রক্তিম/সূর্যটি পশ্চিম'

আমার ধারণা পাথরের তলায় অর্থাৎ কেল্লার পাথরের তলায় ঢেকে রাখা আছে আরও এক পাথর, যা পেলে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে। তারপরের লাইন দ্যাখো, *'ঘোরে কাল'*। কাল মানে সময়, মানে টাইম। *'কণ্টক'* মানে কাঁটা। ঘণ্টাঘরের মাথায় বসানো পাথরের পুরনো সূর্য ডায়াল দেখেছ তো? ওর সময়-চিহ্নগুলো কণ্টক বা কাঁটার মতো খোঁচা-খোঁচা। এখন জ্যৈষ্ঠ মাস। 'গৌতমে এক কম'। জ্যৈষ্ঠ মাসের 'মধ্যম' মাঝে অর্থাৎ গৌতম-এর মানে? এখানে গৌতম মানে বুদ্ধ। বুদ্ধপূর্ণিমা। কাল বুদ্ধপূর্ণিমা। মানে আজ বুদ্ধপূর্ণিমার থেকে একদিন কম। পনেরোতে কম ছয় অর্থাৎ ছ'টা বাজতে পনেরো মিনিট হতে হবে। কখন হবে? না, সূর্যটি পশ্চিম। অর্থাৎ বিকেল পৌনে ছ'টায়। সকালে তো আর সূর্য পশ্চিমে থাকে না। সেই সময় সূর্যের আলোয় ঘড়ির নবম কাঁটার ছায়া কেল্লার কোথায় পড়ছে সেটা দ্যাখো।"

"ওরে বাবা," পুনিত গলায় সোনার চেনটা ঘোরাল। বলল, "তা

http://boierpathshala.blogspot.com
Scanned with CamScanner

কোথায় পড়ছে ছায়া?"

"ওইখানে।" শ্রবণ একবার ঘড়িটা দেখে উঁচু ঘণ্টাঘরের দিকে তাকাল। তারপর ঘণ্টাঘরের মাথার সান ডায়ালটা দেখিয়ে আঙুল ঘুরিয়ে নির্দেশ করল কেল্লার মধ্যে চাতালটার একটা কোনায়। তারপর দ্রুত সেই দিকে এগোতে-এগোতে বলল, "কাম অন কুইক। ব্যাগটা নিয়ে ফলো করো আমায়।"

শ্রবণ, যেখানে কাঁটার ছায়াটা পড়েছে সেখানকার জমে থাকা মাটি পা দিয়ে সরাতে লাগল। বলল, "সরাও, পাথরের উপর জমে থাকা মাটি সরাও তাড়াতাড়ি। এখানে দ্বিতীয় চিহ্ন আছে।"

পুনিত ব্যাগ থেকে ছোট বৈদ্যুতিন পাখার মতো যন্ত্র বের করল। তারপর নিমেষে ভিতরে জমে থাকা মাটি সরিয়ে দিল। শ্রবণ ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখে চিৎকার করে উঠল, "পেয়েছি, পেয়েছি। এই দ্যাখো, শঙ্খ। *'শঙ্খের পেটে পা'* অর্থাৎ শঙ্খের পেটের থেকে *'আরও নয় নীচে হাঁটি।'* মানে ন' পা নীচে হাঁটতে হবে।

"পা মানে? কার পা? এক-একজনের পা তো এক-এক মাপের?" পুনিত জিজ্ঞেস করল।

"ওঃ! এই পা সেই মানুষের পা নয়। এটা 'ফুট'। এই শঙ্খের পেটের থেকে নীচে, মানে যে-কোনও ম্যাপের নীচের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে ন' ফিট যেতে হবে। তুমি টেপটা বের করো।"

পুনিত দ্রুত ন' ফিট মেপে জায়গাটায় দাগ দিল। তারপর আবার বৈদ্যুতিন পাখার মতো যন্ত্রটা দিয়ে সরিয়ে দিল পাথরের উপর জমে থাকা মাটি। শ্রবণ হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "এই যে গদা, *'সব চেতনার ধন/ গদাধর ভগ্‌বন্‌।'* দ্যাখো, গদার হাতলের শেষে *'গদা শেষ চেতনা'* চেতনা বা বোধি। এই যে গদার নীচে বোধিবৃক্ষের ছবি পাথরের উপর। আর তার তলায় এই যে পুনিত, তোমার আবিষ্কার।"

"আ-আমার?" পুনিত ঘোলাটে চোখে তাকাল, "মানে?"

"মানে, আমি মূর্খ ছিলাম। বোকার মতো হরিধনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কারণ, ওটা হরিধন রায়চৌধুরী নন। ওটা *'হরি ধন সামলায়।'* তুমি সেদিন 'ও হরি' বলামাত্র আমি বুঝেছিলাম ব্যাপারটা। 'হরি' আর 'ধন'-এর মাঝের স্পেসটা, ফাঁকটা আমি লক্ষই করিনি। ওটা হরি, মানে পদ্ম। ওই দ্যাখো, পদ্মচিহ্ন আঁকা একটা চৌকো পাথর। তার তলায় আছে গুপ্তধন। 'হরি ধন সামলায়'। আর ওই যে *'খুঁজে পেলে গড়তে'* মানে, 'গড়' এখানে কেল্লা অর্থাৎ কেল্লায়। পদ্মচিহ্ন আঁকা পাথরের তলায় আছে এমন এক সম্পদ যা পেলে *'পাথরের কেল্লার/বেড়ে যাবে জেল্লা।'* বুঝেছ?"

পুনিত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শ্রবণের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু কী আছে ভিতরে? তুমি তো সে বিষয়ে তেমন কিছু বলছ না? যখনই জিজ্ঞেস করেছি 'পরে বলব' বলে সরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু আজ বলতেই হবে তোমায়।"

শ্রবণ হাসল, "দুর্লভকান্তি ছিলেন দক্ষ ভাস্কর। পাথর কেটে মূর্তি বানাতে পারতেন। রায়চৌধুরীদের বাড়িতে ওঁর বানানো অনেক মূর্তি রয়েছে। আর উনি ছিলেন বৈষ্ণব। অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক। লক্ষ্মণ সেনও ছিলেন বৈষ্ণব। ওঁর বাবা ও ঠাকুরদা শৈব হলেও লক্ষ্মণ সেন নিজে ছিলেন বৈষ্ণব। আর মাথা দ্যাখো দুর্লভকান্তির, বিষ্ণুর চারটি বস্তু কীভাবে ব্যবহার করেছেন সংকেতে!"

"মানে? কোন চারটি বস্তু?"

"চাকা বা চক্র, শঙ্খ, গদা আর হরি বা পদ্ম। বিষ্ণুর সর্বক্ষণের সঙ্গী ওরা।"

"কিন্তু সেসব তো হল। গুপ্তধন, গুপ্তধন যে বলছ, সেটা কী বস্তু?"

শ্রবণ বলল, "তোমার যন্ত্রটা ওই পদ্মচিহ্ন আঁকা পাথরের উপর লাগিয়ে পাথরটা সরাবার ব্যবস্থা করো। আমি বলছি।"

পুনিত ব্যাগটা খুলে চারপেয়ে যন্ত্রটা বের করে পদ্মআঁকা পাথরে লাগিয়ে পাথরটার গায়ে লুডোর ছক্কার পাঁচ সংখ্যাটার মতো করে বিস্কুট রঙের সাবানের মতো জিনিস পাঁচ জায়গায় লাগিয়ে দিল। তারপর একটা মোটা রবারের শিট ঢেকে দিল তার উপর। আর সেই রবারের চাদরটার উপরে লাগিয়ে দিল একটা যন্ত্র।

"কাজ করবে তো?" শ্রবণের গলায় দ্বিধা, "পাথরটা ফাটবে তো? শব্দ হবে না তো?"

"হুঁঃ!" তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল পুনিত, "ওই পাঁচটা সাবানের মতো জিনিস হল প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। আর মোটা রবারটা হল বিশেষভাবে তৈরি সাইলেন্সর প্যাড। কোনও শব্দ হবে না। শুধু পাথরটা 'X'-এর মতো করে ফেটে যাবে। ওসব ভেবো না। পাথরের তলায় হিরে-জহরত আছে তো?"

"তার চেয়েও বেশি কিছু আছে।" শ্রবণ বলল, "বখতিয়ার খলজি নবদ্বীপে এসে লক্ষ্মণ সেনকে হটিয়ে দেওয়ার আগে উত্তর ভারত থেকে লুণ্ঠন করতে-করতে আসছিলেন। পথে ওদান্তপুরায় একটা বৌদ্ধ বিহারকেও দুর্গ মনে করে ভুল করে আক্রমণ করে বসেন। সেখান থেকে দু'-চারজন বৌদ্ধভিক্ষু প্রাণ ও একটা ভীষণ গোপনীয় জিনিস নিয়ে পালিয়ে এসে লক্ষ্মণ সেনের কাছে ওঠেন। লক্ষ্মণ সেন অন্য কেউ হলে সাহায্য করতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু, বৈষ্ণবদের বিষ্ণুর দশ অবতার তত্ত্বের মতে গৌতম বুদ্ধ নবম অবতার। তাঁর মন্ত্রশিষ্যদের লক্ষ্মণ সেন ফেরাবেন কী করে? ফেরাননি উনি। ওই ভিক্ষু মূল্যবান জিনিসটি লক্ষ্মণ সেনের কাছে গচ্ছিত রাখেন। আর লক্ষ্মণ সেন খলজির আক্রমণে নিজেও যখন পালালেন, ওই মূল্যবান জিনিসটাকে হাতছাড়া করলেন না। তবে লখনসায়রে এসে এমন বেকায়দায় পড়লেন যে, জিনিসটা গচ্ছিত রাখতে বাধ্য হলেন বা ভরসা করে রাখলেন। কারণ, এই রায়চৌধুরীরাও যুগ-যুগ ধরে বৈষ্ণব।"

"ধ্যাত! গুপ্তধন কী আছে বলো?"

"দুর্লভকান্তি সেটাই তো ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। নয়, মানে নবম অবতার, চেতনা, বোধিবৃক্ষের ছবি, বুদ্ধপূর্ণিমার সংকেত। আরে বাবা গৌতম বুদ্ধের ব্যবহৃত জিনিস আছে। উনি যে পাথরের পিঁড়ির উপর বসতেন, সেটা। *'পাথরে পাথর ঢাকা'*, পদ্মআঁকা পাথরের তলায় ঢাকা আছে অন্য পাথর, বুঝেছ? কয়েক শতাব্দী ধরে এটার একটা গল্প রূপকথার মতো ভেসে বেরিয়েছে। আজ সেটা আমাদের সামনে। পৃথিবীতে এর দাম বুঝতে পারছ? হিরে-জহরত এর কাছে লাগে?"

পুনিত হাঁ করে শুনল গোটাটা। তারপর আচমকা বলল, "তা হলে আর দেরি নয়। পিছনে সরো, পিছনে সরো। পাথরটায় ফাটল ধরাতে হবে। এবার তা হলে...!"

পুনিত ব্যাগ থেকে গোল বলের মতো একটা জিনিস বের করে তাতে লাগানো বোতাম টিপতে যাবে, হঠাৎ কোত্থেকে খয়েরি রঙের লোমশ কিছু একটা এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে। আচমকা ধাক্কায় বলটা মাটিতে পড়ে গেল। পুনিতও উলটে পড়ল পাথরের উপর। আর দেখল, একটা কুকুর। কুকুর? কোত্থেকে এল? মাটি থেকে উঠতে যাবে কিন্তু তার আগে 'পুঁই-ই' করে শিস শুনল পুনিত, আর দেখল, কুকুরটা মাটিতে পড়ে থাকা বলটা তুলে নিমেষে দৌড়ে গেল দূরে একটা থামের আড়ালে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে, শ্রবণও কিছু বুঝতে পারল না। পরে হুঁশ ফেরায় কুকুরটার পিছনে দৌড়ল। পুনিতও পিছু নিল।

কিন্তু কই কুকুর? বলটাই বা কোথায়? ওটা ছাড়া তো পাথর ফাটানো যাবে না। ওটাই তো রিমোট। ওর দু'টো বোতাম পরপর না টিপলে তো আর ফাটবে না পাথর। তা হলে উপায়? শ্রবণের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। কোথায় গেল বলটা?

"এই যে, এইখানে!" উপর থেকে আচমকা চিৎকারটা আসায় শ্রবণ ঘুরল। আরে, এ এখানে কী করছে? এ তো হরিধনের নাতি, শান্টু!

"দাও ওটা। দাও বলছি।" শ্রবণ চিৎকার করল।

"দেব না। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। তোমরা চোর। দেশের জিনিস বিক্রি করে দাও। এটা দেব না। এটা দিয়ে তুমি কী করবে আমি জানি। টিভিতে অনেক দেখেছি।"

"দাও শান্টু, নইলে...!" পুনিত বন্দুক বের করল।

"ধরতে পারলে কেড়ে নাও," শান্টু কথা বলেই ছুট লাগাল।

পুনিত বন্দুক তুলল। কিন্তু তার আগেই শ্রবণ হাত দিয়ে বন্দুকটা

http://boierpathshala.blogspot.com
Scanned with CamScanner

নামিয়ে বলল, "পাগল তুমি? এখানে খুনারাপি করবে? তাও একটা বাচ্চাকে? ধরো ওকে। চলো।"

মোটা পাঁচিলের উপর দিয়ে দৌড়তে লাগল শান্টু। একটু এদিক-ওদিক হলেই ডান দিকে গঙ্গার বাঁধের দিকে পড়বে। ও দেখল, ওই দু'জনও তাড়া করেছে। শান্টু বুঝল এভাবে বেশিক্ষণ পারবে না। সামনে পাঁচিলটা ভেঙে ছোট হয়ে এসেছে। এর ডান দিকে ঘণ্টাঘর আর বাঁ দিকে বিরাট বটগাছ। এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে বেরোলে অনেকটা ঢালু হয়ে নীচে আরও একটা চাতাল। সেখান থেকে কেল্লার প্রধান তোরণ স্পষ্ট দেখা যায়।

শান্টু দৌড়তে-দৌড়তেই ভাবল, কী করবে? যুবক ছেলেটা যে গতিতে দৌড়চ্ছে তাতে ওকে এক মুহূর্তে ধরে ফেলবে। ওই ঢালু বেয়ে নীচে নেমে লাভ নেই। তার চেয়ে...। শান্টু চোয়াল শক্ত করল। উপায় একটাই। শান্টুর চেয়ে ওদের বলটা বেশি দরকার। তাই..., শান্টু আচমকা গোল রিমোটটা ছুড়ে দিল ঘণ্টাঘরের দিকে। তারপর নিজে স্লিপের মতো ঘষটে নেমে গেল চাতালে।

শ্রবণ আর পুনিত থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর ভাঙা পাঁচিল থেকে উঠে যাওয়া দেওয়ালের খাঁজে পা রেখে বেয়ে-বেয়ে উঠতে লাগল ঘণ্টাঘরের দিকে। রিমোটটা নিতে হবে। নিতেই হবে।

চাতাল থেকে ওদের স্পষ্ট দেখল শান্টু। ওই ওরা উঠছে। ওই শ্রবণ উঠল প্রথমে, তারপর ওই উঠল পুনিত। আর... এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ!

"ওরে বাব্বা!"

দু' হাত তুলে লাফিয়ে উঠল শান্টু। জাস্ট পাঁচ সেকেন্ড, আর তার মধ্যেই লাল পিঁপড়েরা তাদের কেরামতি দেখাতে শুরু করল। ঘণ্টাঘরের মেঝের মাটিতে যে লক্ষ-লক্ষ লাল পিঁপড়েদের বাস! ও তো সেই জন্যেই বলটা ছুড়ে দিয়েছিল ঘণ্টাঘরের দিকে।

চাতালে দাঁড়িয়ে শান্টু দেখল, দু'জনে প্রচণ্ড লাফাচ্ছে আর চিৎকার করছে। এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, লাল পিঁপড়েরা দু'জনের হাঁটু অবধি দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এখনও তো দু' নম্বর দাওয়াই বাকি আছে। শান্টু একটা ইট তুলে নিল হাতে। তারপর নিখুঁত টিপে ছুড়ে মারল ঘণ্টাঘরের কোনায় ঝোলা ওই ভিমরুলের চাকে। বিঙ্গো! ভিমরুলের ফৌজ সেই আঘাতের উত্তরে বোঁ-বোঁ শব্দ করে বোমারু বিমানের মতো আক্রমণ করল শ্রবণদের।

শান্টু চাতাল থেকে দেখল, ঘণ্টাঘরের মধ্যে ওই দু'জন কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল ধপ করে।

"শান্টু," পিছন থেকে বাবার গলাটা চমকে দিল শান্টুকে। ও পিছনে ফিরল। দেখল, বাবা, সোনাদা, ঠাকুরদা, তমো, দ্বৈপায়ন, ইহিত, স্কুলের আরও ছেলেরা আর অনেক পুলিশ এসে পড়েছেন।

শান্টু চিৎকার করে উঠল, "ওই যে ওরা ওইখানে... ওই ঘণ্টাঘরে। তবে পালাতে পারবে না। পিঁপড়ে আর ভিমরুল একদম জব্দ করে দিয়েছে ওদের।"

পুলিশের মধ্যে থেকে সাধারণ জামা-প্যান্ট পরা একটা মানুষ বেরিয়ে এসে হাত রাখল শান্টুর কাঁধে। লোকটা বলল, "হ্যালো শান্টু, আমি অয়নাঙ্ক রায়। সরকারের পক্ষ থেকে তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। তোমার জন্যই ওরা ধরা পড়ল। আর মূল্যবান প্রত্নতত্ত্বের জিনিস আমাদের দেশেই থাকল। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস!"

শান্টু কিছু বলার আগেই স্কুলের ছেলেরা এসে ঘিরে ধরল ওকে। নিমেষে কাঁধেও তুলে নিল। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা দ্বৈপায়ন তো একদম 'থ্রি চিয়ার্স' পর্যন্ত বলে ফেলল!

পুলিশের লোকজন শ্রবণ আর পুনিতকে অচেতন অবস্থায় নামাল। পুলিশের লোকজন তারপর পাথর ভেঙে বের করল মলিন কাপড়ে জড়ানো একটা পাথরের চ্যাপটা পিঁড়ি। শান্টু জিজ্ঞেস করল, "এটা কি সত্যি বুদ্ধদেবের পিঁড়ি?"

অয়নাঙ্ক বললেন, "কী জানি! সে তো বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলবেন। তবে খুব পুরনো যে তাতে সন্দেহ নেই। পিঁড়ি না হলেও এর গায়ে যেসব ছবি খোদাই করা রয়েছে তার ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। সত্যি তুমি দারুণ কাজ করেছ শান্টু। তোমার জন্য এই শয়তান দু'টোও ধরা পড়ল।"

খবর পেয়ে লখনসায়র থেকে মানুষজনও আসতে শুরু করেছে এবার। বাবা আর ঠাকুরদা অয়নাঙ্কর সঙ্গে কথায় ব্যস্ত। বন্ধুরাও গোটা ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছে। শান্টুর নিজেকে খুব একা মনে হল হঠাৎ। কেউ ওর সঙ্গে কথা বলছে না। মনে হল, ওদের কারও টিমেই ও নেই।

শান্টু গাবদুকে বগলদাবা করে ভাঙা পাঁচিল বেয়ে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল ঘণ্টাঘরের দেওয়ালের উপর। না, মাটিতে নামল না। পিঁপড়ে বা ভিমরুলকে বিরক্ত করল না ও। বরং তাকিয়ে রইল গঙ্গার দিকে। ওই পশ্চিম পারে সূর্য ক্রমশ গলে-গলে মিশে যাচ্ছে জলে। সেই দিকে তাকিয়ে রইল শান্টু।

সোনাদা নিচ থেকে দেখল। আর তার পাশ থেকে দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, শান্টু এমন একটা কাজ একা করল কীভাবে বলো তো?"

সোনাদা হাসল। বলল, "একা কোথায়? শান্টু তো একা নয়। একা কিছু করেনি তো!"

"তা হলে?" দ্বৈপায়ন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

সোনাদা বলল, "বগলে কুকুর, পায়ের কাছে পিঁপড়ে, মাথার উপর ভিমরুল। শান্টু একা কোথায় রে? ওই দ্যাখ শান্টু, আর ওই দ্যাখ শান্টুর টিম!"

(লক্ষ্মণ সেন আর বখতিয়ার খলজি ছাড়া গল্পের পুরোটাই মনগড়া। কোনও মিল থাকলে তা কোইন্সিডেন্স ছাড়া আর কিছু নয়। গৌতমবুদ্ধের পিঁড়ির ব্যাপারটাও পুরোটা কাল্পনিক।)

http://boierpathshala.blogspot.com